কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭

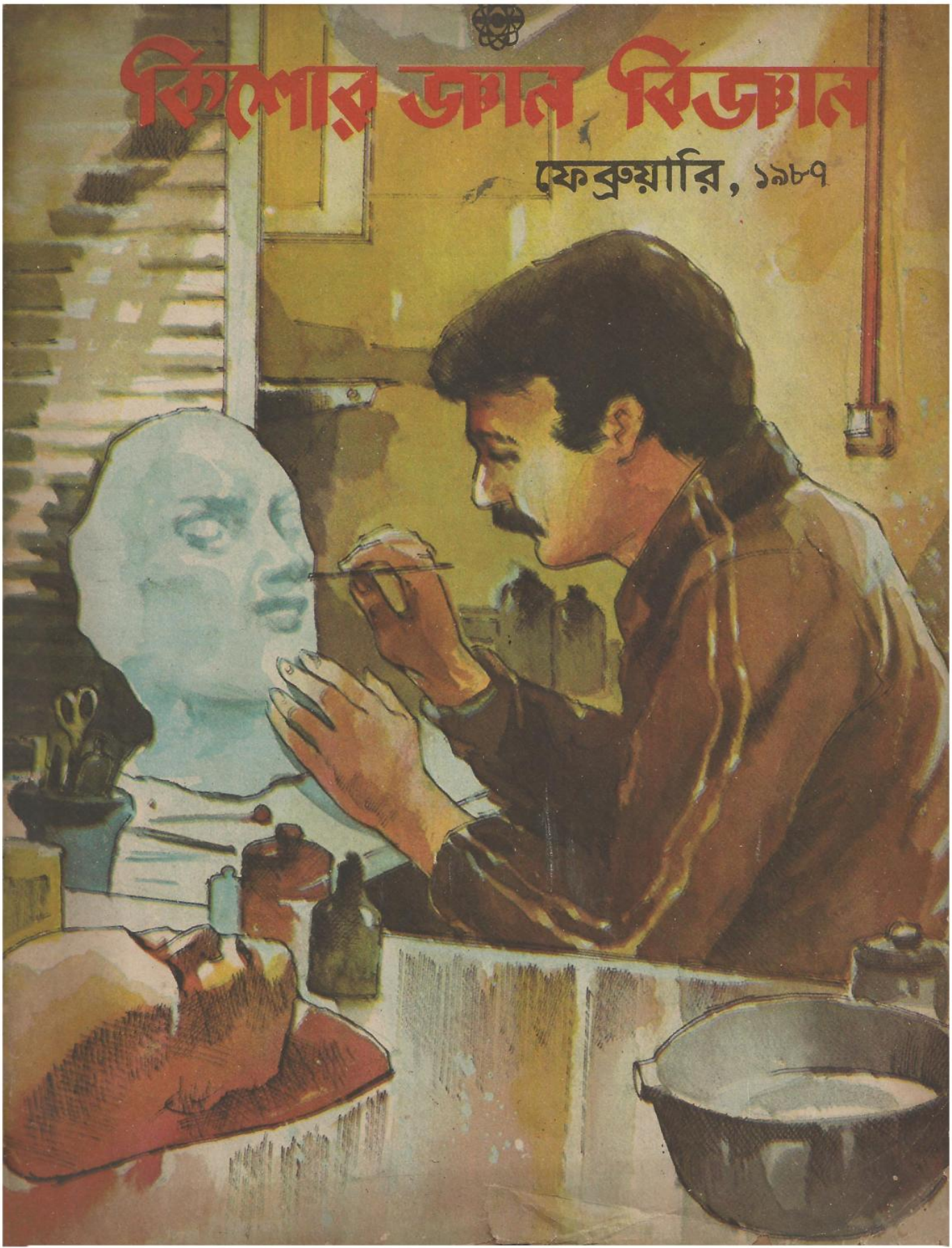

ফ্যান্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স** ১৫
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **চারমূর্তি** ১০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **রামধনু** ১০
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
গুপীগাইন বাঘাবাইন ৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদার জুড়ি নেই** ১০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **কম্বল নিরুদ্দেশ** ৮
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের মজার গল্প ১০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা** ১০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **ঝাউবাংলোর রহস্য** ৭
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০

ঘনাদা কাহিনীর নতুন চমক !

মৌলিক কাহিনী সার বিপণন সংস্থা ঘনাদাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে— গল্পের প্লট সাপ্লাই করবে ঘনাদা কিভাবে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবেন ?

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদা ও মৌকাসাবিস ১৫

জীবনচরিতমালা

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি
প্রণীত জীবন চরিতমালা
প্রতি খণ্ড দশ টাকা

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ॥ পরমাণু বিজ্ঞানী ভাবা
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ॥ কৃতী বিজ্ঞানী
মেঘনাদ ॥ বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র
কৃতী বিজ্ঞানী সি· ভি· রমন
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ
পরমাপ্রকৃতি সারদামনি
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
আলোকময়ী শ্রীম

রহস্য রোমাঞ্চ ভৌতিক গল্প

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **ভৌতিক গল্প** ১০
আনন্দ বাগচি ॥ **মুখোশের মুখ** ৮
কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর রহস্য গল্প** ১০
কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর রোমাঞ্চ গল্প** ১০
কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর গোয়েন্দা গল্প** ১০
হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **মোহনপুরের শ্মশান** ৬
দেবব্রত চক্রবর্তী ॥**শেরিংহত্যা রহস্য** ১০
হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **যক্ষপতির রত্নপুরী** ৬
দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ **যখের আসন** ১০

সম্প্রতি প্রকাশিত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

কিশোর রহস্য গল্প

কিশোর রোমাঞ্চ গল্প

প্রতিটি দশ টাকা

পশুপাখি বনজঙ্গলের গল্প

অমিতাভ চক্রবর্তী **ছোটদের বাঘের গল্প** ৮
কেনেথ আন্ডারসন
শিবানীপল্লীর কালো চিতা ২০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ **বনে জঙ্গলে** ১৫
অজয় হোম ॥ **বিচিত্র জীবজন্তু** ১২
কেনেথ অআন্ডারসন
মানুষখেকোর বিভীষিকা ১৫

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ **বাঙলার গাছপালা** ১৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র॥ **মেজো কর্তার ভৌতিক গল্প** ১৫
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ **শেকসপীয়ারের গল্প** ১০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়॥ **ছোটদের মজার গল্প** ১০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়॥ **সবার প্রিয় টেনিদা** ১০

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ দশম সংখ্যা ফেব্রুয়ারি 1987

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 4 ঃ **দপ্তর থেকে** ঃ নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী '86 ॥ সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ঃ ইওরোপ সেভার ॥ শঙ্কর ঘটক 25 ঃ টেলিপ্যাথি ॥ অশোক বসু 22

বিশেষ রচনা ঃ কৃত্রিম রবার ॥ মৃণ্ময়ী দাস 19

পড়াশোনা ঃ ভৌত বিজ্ঞানে বেশি নম্বর পেতে হলে ॥ অজয় চক্রবর্তী 51 ঃ জীবন বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ॥ দিনোজ কুমার দে 15 ঃ জ্যামিতির উত্তর দান সম্পর্কে আলোচনা ॥ অসীম মুখোপাধ্যায় 17 ঃ একটি ক্ষারধর্মী গ্যাস ॥ অমরনাথ রায় ও বিবেক রায় 50

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা ঃ পরিবেশ ও আমরা ॥ দীপাঞ্জন মিত্র 9 ঃ বিজ্ঞান সংবাদ 6 ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র খবর ॥ বরুণ মজুমদার 6 ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই 21 ঃ স্কুটার সিগন্যাল সিস্টেম ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 52

জীবজন্তু ও গাছপালা ঃ ধুতুরা গাছের গুণাগুণ ॥ চন্দন কুমার দাস 39

রঙিন ফিচার ঃ প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 11 ঃ সিনিয়র ক্যুইজ কনটেন্ট ও ফটো ক্যুইজ কনটেন্ট 12 ঃ মিকি ডোনাল্ডের গল্প ॥ অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ 13 ঃ জুনিয়র ক্যুইজ ও ফটো ক্যুইজ কনটেস্ট 56 ঃ বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 57 ঃ চেনা-অচেনা ফুল ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 58 লাজুক বানর লোরিস ॥ তারকমোহন দাস ও সীমা সেন 14 :

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ ইউক্লিড ॥ হিরণ্ময় রায় 41

জীবন চরিত ঃ রেমব্রাণ্ট ঃ কিয়ারসকুরো ঃ অহিভূষণ মালিক 27

ধারাবাহিক উপন্যাস ঃ নরবানরের গ্রহে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 31

ছবিতে গল্প ঃ খুদে বিজ্ঞানী ॥ দিলীপ দাস 23 ঃ ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস ॥ গৌতম কর্মকার 43

ছোটদের দপ্তর ঃ সফল উত্তরদাতাদের নাম 59 ঃ শব্দকুট ॥ কনককিরণ ঘোষ 63 ঃ অভিনব রেফ্রিজারেটর ॥ অরুণকুমার রায় 62 ঃ ক্যাসেড ॥ সৌগত দত্ত 61 ঃ প্রশ্নোত্তর ॥ সুধাংশু পাত্র 64

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি ঃ অলয় ঘোষাল

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর। সম্পাদক ঃ রবীন বল। সহসম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত।

ভারতে প্রথম কাগজের ব্যবহার

'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' ডিসেম্বর-86 সংখ্যায় কাগজপ্রসঙ্গে সমীরকুমার সূত্রধরের বক্তব্যের উত্তরে জানাচ্ছি ঃ

Papyru -এর উচ্চারণ প্যাপিরাস নয়, প্যাপাইরাস। যে-কোনো ইংরেজি অভিধান খুলে উচ্চারণ দেখে নিন। প্যাপিরাস আমাদের নলখাগড়া নয়। এর ইংরেজি নাম রিড। এই জলজ উদ্ভিদের পাতা লেখার কাজে ব্যবহার করা হত। আমাদের দেশে যেমন তালপাতা, ভুর্জ (বার্কজাতীয় পাহাড়িগাছ) পাতা। রিড কী, থর হেয়ারদ্যালের 'রা' বইটিতে দেখে নিন। ছবি আছে।

এই শব্দগুলি লক্ষ্য করুণ ঃ চা, চেয়ার, টেবিল, আলকাতরা, টমাটো, পেঁপে, কামান, বন্দুক, মোটর। কোনো দেশে কোনো ব্যবহার্য জিনিসের নামই বলে দেয়, সেটি কোন্ দেশের—যদি না সেটির স্থানীয় নাম থাকে। ওই জিনিসগুলি যে বাইরে থেকে আমদানি, তা বোঝার জন্য বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। কারণ ওগুলির স্থানীয় নাম নেই। তেমনি কাগজ একটা জিনিস। এর কোনো স্থানীয় নাম কস্মিনকালে ছিল না। কাগজ যে ফার্সি শব্দ, যে-কোনো বাংলা অভিধান খুলে দেখে নিন। সাধারণ জ্ঞানের সাহায্য নিলে অনেক অহেতুক ঝুটঝামেলা এড়ানো যায়।

'কাগজের আবিষ্কার যে ভারতে প্রথম সে বিষয়ে অনেক পণ্ডিত একমত।' এটা যুক্তি নয়, একটা ভাসা-ভাসা ও উদ্ভট মন্তব্য। ধরে নিচ্ছি, অনেক পণ্ডিত একমত। তাঁরা কারা? কিসের ভিত্তিতে তাঁরা একমত? ডঃ এচ আর কাপাড়িয়া হোন, আর যেই হোন, তাঁর হাতে তথ্যপ্রমাণটা কী? আর বি পাণ্ডেরও একই নামে একটি বই আছে। পড়ে নেওয়া উচিত। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত বই।

ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে পাথর, ধাতব দ্রব্য এবং অল্পকিছু তালপাতার পুঁথিতে। তালপাতাই ছিল মোটামুটিভাবে ভারতব্যাপী কাগজের বিকল্প জিনিস। খরোষ্ঠী লেখা হত আরবি-ফার্সির মতো ডান দিক থেকে। এ লিপি আরামীয় লিপির অনুকরণে সৃষ্ট। প্রাক-মুসলিম যুগের ভারতে সমস্ত লেখালেখি চলেছে পাথর, ধাতব দ্রব্য, তালপাতা, ভুর্জপাতা, পোড়ামাটির ফলকে,। মুসলিমরাই ভারতে কাগজ আমদানি করেছিল। কিন্তু শাস্ত্রীয় সংস্কারে হিন্দুরা ব্যাপকভাবে কাগজ ব্যবহারে রাজি ছিলেন না। আঠারো শতকেও তালপাতার পুঁথি লেখা হত। এমনকী, আমরাও শৈশবে হস্তাক্ষর অভ্যাস করেছি তালপাতায়। অর্থাভাবে নয়, এটাই ছিল এদেশের ঐতিহ্যসম্মত রীতি। যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে বলি, এই সহজলভ্য বইদুটি পড়ে নিন ঃ সমরেন্দ্রনাথ সেনের 'বিজ্ঞানের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) এবং সদ্যপ্রয়াত ব্যাশাম সায়েবের দা ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া'। ব্যাশামের বইতে খরোষ্ঠীর ছবিও আছে।

'যাজ্ঞাবল্ক্য স্মৃতি'র কোন শ্লোকে কাগজের (i) উল্লেখ আছে? 'ন্যারকুস' নয়, নেয়ারকাস (Nearchus)। এঁর সম্পর্কে পড়ুন আরিয়ানের লেখা 'দ্য ক্যাম্পেন এক আলেকজাণ্ডার।' পেঙ্গুইন পেপায়ব্যাকে সুলভ। নেয়ারকাসের কী বর্ণনা, বিশদ পেয়ে যাবেন। মেগাস্থিনিসের বইটি লুপ্ত।

প্রসঙ্গ ঃ মানুষ খেকো গাছ

গত 'আগস্ট 1986' সংখ্যায় 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে বীরভূমের সুদীপ্ত সেনগুপ্ত ও পুরুলিয়ার বিমল মাহাতোর একটি প্রশ্ন যা ছিল ঃ 'শুনেছি, এক ধরনের গাছ নাকি মানুষ খায়?' এরা কোথায় জন্মায় এবং নাম কি? এই প্রশ্নের লেখকের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।

কারণ 1391 সালের শারদীয় 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে' 'দেশ-বিদেশের গাছ-পালা' শীর্ষক প্রবন্ধে ডঃ তারকমোহন দাসের লেখাটি উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গক্রমে কিছু অংশ পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তুলে দিলাম—'আফ্রিকার গভীর অরণ্যে এক ধরনের উদ্ভিদ বাস করে, সাধারণ উদ্ভিদের মতই তাদের বাইরের চেহারাটা বেশ নিরীহ। তারা সর্পিল ডাল-পালা মেলে ওৎ পেতে বসে থাকে শিকারের আশায়, হঠাৎ ভুল করে কোন জীব-জন্তু বা মানুষ তাদের নাগালের মধ্যে গিয়ে পড়লেই সরু লিক্‌লিকে ডাল-গুলি প্রসারিত করে অক্টোপাসের মত আষ্টে-পৃষ্ঠে তাকে বেঁধে ফেলে, তার-পর বিষাক্ত কাঁটার ঘায়ে শিকারকে আচ্ছন্ন করে ধীরে ধীরে তার রক্ত-মাংস হজম করতে থাকে। কয়েকদিন পরে তাদের বাহুপার্শ্ব শিথিল হলে দেখা যায় শিকারের হাড়গুলি মাত্র অবশিষ্ট আছে। ঘোড়াসুদ্ধ একটি ঘোড়-সওয়ারকেও তারা এইভাবে হজম করে ফেলবার ক্ষমতা রাখে।"

উদ্ভিদ সম্পর্কে এ গল্প খুবই রোমাঞ্চকর এবং চিত্তাকর্ষক তাতে সন্দেহ নেই, তবে এর সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। এই ধরনের মানুষ খেকো উদ্ভিদ পৃথিবীতে নেই,

গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিকদের বইতে তাঁর বিবরণের উল্লেখ এবং কিছু উদ্ধৃতি আছে। ভারত সম্পর্কে মেগাস্থিনিসের বিবরণ স্থানে-স্থানে এমন উদ্ভট ও হাস্যকর কহতব্য নয়। বা মেগাস্থিনিসের বিবরণে কাগজ-টাগজ নেই। ডি ডি কোশাম্বীর বইগুলি পড়ুন এবিষয়ে। মেগাস্থিনিস সম্পর্কে প্রামাণিক বই জে ডব্লিউ ম্যাকক্রিণ্ডলের 'Ancient India as described by Megasthenes and Arrian' সংগ্রহ করে পড়া দরকার। স্ট্রাবোর ইতিহাস বইটিও উল্লেখ্য। কলকাতার ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

'এল পি বারনেট' নন, এল ডি বার্নেট। তাঁর বই Antiquities of India প্রথম বেরোয় লণ্ডনে ১৯১৩ সালে। বইটি পড়ুন। কাগজ আবিষ্কৃত হয়েছিল চীনে দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে। ভারতে আমদানি হয় মুসলিমসূত্রে। বৌদ্ধধর্মের প্রচারের মাধ্যম ছিলেন মহামাত্র, শ্রমণ, ভিক্ষু পরিব্রাজকরা। ভারতে সমস্ত প্রাক-মুসলিম যুগের বৌদ্ধ গ্রন্থ তালপাতা, ধাতবদ্রব্য ও পাথরে লেখা। কাগজ জিনিসটার প্রতি প্রাচীন হিন্দুদের দ্বিধার কারণ মণ্ড (মাড়), যা অশুচি।

সমীরবাবু দেশের সংরক্ষণাগারগুলিতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসুন প্রাচীন ভারতে লেখালিখির জন্য কী কী জিনিস ব্যবহৃত হত। ব্রাহ্মীলিপিও খরোষ্ঠীর মতো সেমিটিকলিপির বংশধর। ডেভিড ডিরিঞ্জারের 'দা অ্যালফ্যাবেট' বইটি পড়ুন। ভারতে লিপিপ্রচলনের আগে সবই ছিল 'শ্রুতি' অর্থাৎ বিদ্বানদের মুখস্থ।

শেষে একটা কথা। মানবসভ্যতার ভিত্তি বিজ্ঞান। সমস্ত সভ্যতা গড়ে উঠেছে বা উঠেছিল পারস্পরিক লেনদেনে। বিজ্ঞান আন্তর্জাতিক মানবতাবাদ ও মহাচেতনার দিগদর্শন যন্ত্র। মনে রাখা খুবই জরুরি।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ—কলকাতা-14

সেপ্টেম্বর সংখ্যা (1986) কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রীছন্দোময় মণ্ডলের 'চাঁদের বুকে মানুষ' শীর্ষক চিঠি পড়লাম। বিমান বসুর তথ্যই ঠিক। তালিকাটিও ঠিক। তবে অ্যাপোলো-17 অভিযাতে চাঁদে হাঁটা মানুষ দুটির একজনের নাম ছাপা হয়েছে 'এ. সেরননি'। ওটি হবে সারন্যান (Cernan)। শনিগ্রহের বলয়ের সংখ্যা প্রকৃতই কয়েক হাজার। উল্লেখ্য তথ্য ঃ বৃহস্পতিরও অনুরূপ বলয়ের অস্তিত্ব জানা গেছে।

প্লুটোর উপগ্রহ আছে একটি। তার নাম দেওয়া হয়েছে 'কারণ' (Charon)। শব্দটি গ্রীক। হিন্দু পুরাণে যেমন বৈতরণী নদী, গ্রীক পুরাণে তেমনি Styx নদী। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা এই নদী পেরিয়ে পাতাললোকে যায় এবং নদী পার হয় 'কারণ'-এর নৌকোয়। তাই গ্রীক পুরাণে খেয়া মাঝি হল Charon। প্লুটোর ওই উপগ্রহটি কিন্তু আদতে একটি গ্রহ। প্লুটোর কুক্ষিগত হয়ে উপগ্রহ হয়ে পড়েছে বেচারা। ওর ভর প্লুটোর ভরে এক-দশমাংশ। Charon যেমন প্লুটোর বন্দী, তেমনি আমাদের চাঁদকেও একদল বিজ্ঞানী পৃথিবীর হাতে বন্দীগ্রহ (captured plannet) বলে মনে করলেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, 37/1 গোরাচাঁদ রোড, কল-14

পৃথিবীতে কোন দিন ছিলও না। এই গল্পগুলি একান্তভাবে মানুষেরই চিন্তাশক্তি বা দুশ্চিন্তা শক্তির ক্রমবিকাশ বলা যেতে পারে।' সুতরাং প্রশ্ন থেকেই যায় কোনটি সঠিক তথ্য? এর সঠিক তথ্য জানতে পারলে আমরা পাঠকবৃন্দ অত্যন্ত উপকৃত হ'ব।

সুব্রতকুমার সাহু, দশগ্রাম, মেদিনীপুর।

গত ডিসেম্বর '86 সংখ্যায় শ্রীরাজা মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'আবিষ্কার ও আবিষ্কারক' নামক প্রবন্ধটি পড়লাম। প্রবন্ধটি পড়ে খুবই ভাল লাগল। তবে প্রবন্ধটির দুটি ভুল চোখে পড়ল।

লেখক শ্রী মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন যে টাইপরাইটারের আবিষ্কারক হলেন আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের অধিবাসী সোমস্। কিন্তু আমি জানি টাইপরাইটারের আবিষ্কারক হলেন আমেরিকার শোলস।

এছাড়া শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে ক্যামেরার আবিষ্কারক হলেন আমেরিকার ইস্টম্যান কোডাক। কিন্তু ক্যামেরা আবিষ্কারকের নাম ইস্টম্যান কোডাক নয়। তাঁর নাম জর্জ ইস্টম্যান। তাঁর আবিষ্কৃত ক্যামেরার নাম 'কোডাক'।

উৎস ঃ ছোটদের বুক অব নলেজ [দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড অক্টোবর, '74] পৃষ্ঠা—824 ও 416

আমি এ বিষয়ে লেখক শ্রীরাজা মুখোপাধ্যায়কে তাঁর প্রবন্ধে লেখা তথ্যের সমর্থনে 'নির্দেশ' (reference) সহ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার পাতায় আলোচনা করতে অনুরোধ করি।

সুনন্দ মুখোপাধ্যায়,

চন্দননগর, হুগলী।

বিজ্ঞান সংবাদ

প্রবন্ধ রচনা ও ছবি আঁকা

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল সায়েন্স সোসাইটি আয়োজিত নিখিলবঙ্গ প্রবন্ধ রচনা ও ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত বিচার সম্পন্ন হচ্ছে। বিচারকমণ্ডলী নিম্নোক্ত প্রতিযোগীদের একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সফল প্রতিযোগীদের নাম ঃ সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী (বেথুন স্কুল), দীপঙ্কর দত্ত (বেহালা আর্য বিদ্যামন্দির), রিপন সোয়েঙ্কা (সেণ্টপলস হাই স্কুল), স্বাগতম মুখার্জী (ডন বসকো স্কুল), এস. কে নূর আলি (এম এ এম সি হাই স্কুল), অলকা জৈন (সেণ্ট টেরেসা হাই স্কুল), রিনি গাঙ্গুলী (সেণ্ট যোশেফ হাই স্কুল), দীপায়ন দত্ত (হেয়ার স্কুল), নিবেদিতা দাস (সেণ্ট টমাস গার্লস হাই স্কুল), দুর্বা মণ্ডল (সেণ্ট যোশেফ হাই স্কুল), সুতপা সরকার (সেণ্ট যোশেফ হাই স্কুল), রীতম সেন (সেণ্ট জেভিয়ার হাই স্কুল), রাজর্ষি রায় (সাউথ পয়েণ্ট হাই স্কুল), স্বাগত গাঙ্গুলী (হোলি চাইল্ড হাই স্কুল), চন্দ্রমৌলি মুখার্জী (রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম, রহড়া), চঞ্চল বসু (হাওড়া জিলা স্কুল)। ওয়েস্ট বেঙ্গল সায়েন্স সোসাইটির পক্ষে এ সংবাদ জানিয়েছেন পার্থসারথি রুদ্র।

চড়কডাঙ্গা উদয়সংঘ আয়োজিত 'সুপ্ত প্রতিভার সন্ধানে' শীর্ষক প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক শান্তি বর্ষ, মে দিবসের শতবর্ষ এবং রবীন্দ্রনাথের 125তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চড়কডাঙ্গা উদয়সংঘ নানান সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। গত 14ই সেপ্টেম্বর, '86 তারিখে একটি ভাবগম্ভীর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কার্যসূচীর সূচনা হয়। বিগত তিন মাস ধরে বিভিন্ন বয়সের প্রতিযোগীদের মধ্যে ক্যুইজ, বিতর্ক, প্রবন্ধ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল কমপিউটার ভারতবর্ষে অভিশাপ নিয়ে আসছে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল 'রবীন্দ্র চিন্তাধারার উত্তরাধিকার এবং আমাদের কর্তব্য'। 25 ডিসেম্বর তারিখে ছোটদের 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে 175 জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। 25 জানুয়ারী, '87 তারিখে দুটি বিভাগে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী 3রা এবং 4ঠা ফেব্রুয়ারি এ প্রতিযোগিতামালার সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে। 3রা ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ক্যুইজ ফাইনাল এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 4ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত হবে গল্প-বলা প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী, সেই সঙ্গে পূর্ব কলকাতার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের সংবর্ধনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ

ইজুমীর পরলোক গমন

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে—মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই সত্য কথাটা তার কবিতায় লিখে গেছেন। সাধুই হোক আর অসাধুই হোক, এমনকি যত বড় লোকই হোক না কেন তাকে মরতেই হবে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। এরই মধ্যে আবার কেউ কেউ বেশিদিন বাঁচেন, আবার কেউ কেউ খুব অল্প বয়সে মারা যান। কিন্তু কোন মানুষ যদি 120 বছর ধরে বেঁচে থাকেন, তবে তাঁকে নিশ্চয়ই বাহাদুরী দিতে হবে। জাপানে এরকম এক ভদ্রলোক দীর্ঘ 120 বছর ধরে বেঁচে থেকে 986 সালের 21-শে ফেব্রুয়ারি মারা গেছেন। ইনি ছিলেন আমাদের বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মানুষ হিসাবে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তাঁর নাম ছাপা হয়েছে। দক্ষিণ জাপানের ছোট একটা দ্বীপের বাসিন্দা এই মানুষটার নাম শিগেচিও ইজুমী। মিস্টার ইজুমী আরও কিছুদিন বাঁচতে পারলে এ বছরের 29শে জুন তারিখে তাঁর বয়স হত 121 বছর। যাই হোক তিনি বাঁচার ক্ষেত্রে অন্ততঃ বিশ্ব রেকর্ড করে গেছেন।

মাথার টাকে চুল

যারা উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্ল্যাড প্রেসার রোগে ভোগেন, তাদের চিকিৎসার জন্য গত 20 বছরে মোনোসডিল নামে একটা ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এই ওষুধের প্রতিক্রিয়া মানে যাকে বলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তা রয়েছে। যাঁরা এই ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন তাঁদের মধ্যে শতকরা 80 জন রোগীর কপালে ও গালের ওপরের অংশে লোম গজিয়েছে। এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে এখন বিজ্ঞানীরা খুব উৎসাহ বোধ করছেন। না, না তাই বলে কপালে চুল গজাবার ব্যবস্থা তারা করছেন না। কেননা কোনো মহিলা রোগীর কপালে বা গালে চুল গজালে তা নিশ্চয় তিনি খুব ভালভাবে গ্রহণ করবেন না। বিজ্ঞানীরা এখন ভাবছেন যাদের মাথায় টাক আছে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যায় কিনা, কেননা এতে হয়তো টেকো মাথায় নতুন চুল গজাতে পারে।

বরুণ মজুমদার

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী সমরজিৎ কর

10 ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কারের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালফ্রেড বার্নার্ড নোবেলের জন্মদিন। সনদ অনুযায়ী গত 10 ডিসেম্বর 1986 স্টকহোমে নোবেল কমিটি কৃতী বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দিলেন 1986 সালের নোবেল পুরস্কার। পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন তিনজন: অধ্যাপক এর্লস্ট রুসকা, ডঃ গের্ড বিনিং এবং ডঃ হাইনরিশ রোহ্‌রের। রসায়নে পেলেন

চিকিৎসা বিজ্ঞানে 1986 তে নোবেলজয়ী
বাঁদিকে: রিতা লেভি মন্তাল কিনি
ডানদিকে: স্ট্যানলি কোহেন

অধ্যাপক ডাডলে আর. হেরশবাক্, অধ্যাপক ইয়ুং টি. লী এবং অধ্যাপক জন সি পোলানি। চিকিৎসাবিজ্ঞানে: ডঃ রিতা লেভি মনতালকিনি এবং ডঃ স্ট্যানলি কোহেন। এ বছরের প্রতিটি পুরস্কারের আর্থিক সম্মান ছিল 290,000 মার্কিন ডলার। এই অর্থের অর্ধেক পেয়েছেন রুসকা, বাকি অর্ধেক সমান দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে বিনিং এবং রোহ্‌রেরকে। রসায়ন এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পুরস্কার মূল্য অবশ্য সমান ভাগেই পেয়েছেন পুরস্কৃত বিজ্ঞানীরা।

প্রচলিত মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে তোমাদের অনেকেরই পরিচয় হয়েছে নিশ্চয়। বলতে কি, বিশেষ এই যন্ত্রটির আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে একটা বড় রকমের ঘটনা। বিশেষ করে জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। উদ্ভিদ্ এবং প্রাণিকোষ, জীবাণু, বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সাধারণ চোখে চিরকাল অদৃশ্যই ছিল। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের চেহারা বিবর্ধন করা সম্ভব হয়েছে, বহুগুণ। যার ফলে তাদের সত্যিকারের স্বরূপ আমরা জানতে পারি। কিন্তু মুশকিল এই, সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যা কিছু আমরা দেখি, সবই দেখি দৃশ্যমান আলোর মাধ্যমে। জীবাণু অথবা কণার ব্যাস 4000 অ্যাংস্ট্রমের চেয়ে ছোট হলে তাকে এই আলোয় আর স্পষ্ট করে দেখা যায় না। জানো নিশ্চয়, 'অ্যাংস্ট্রম' হল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপার একক। যেমন বস্তুর ওজন মাপার 'একক'কে বলা হয় গ্রাম অথবা পাউণ্ড, তরলের আয়তন মাপার 'একক'কে বলা হয় লিটার। সেণ্টি-মিটারের 1: 000000 ভাগের এক ভাগ দৈর্ঘ্যকে বলা হয় 1 অ্যাংস্ট্রম।

বিবর্ধনের জন্য প্রচলিত মাইক্রোস্কোপে ব্যবহার করা হয় কাচের লেন্স। 1920 সালের পর বার্লিনের টেকনি-ক্যাল ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা করতে গিয়ে এক দল বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন, অজস্র ইলেকট্রন কণা যখন নির্দিষ্ট দিক বরাবর অগ্রসর হয়, তাদের চরিত্র তখন আলোক-রশ্মির মত দাঁড়ায়। এ ধরনের রশ্মিকে বলা হয় ইলেকট্রন রশ্মি। তাঁরা এটাও আবিষ্কার করলেন, কাচের লেন্সের মত চৌম্বক কয়েলকে লেন্স হিসেবে ব্যবহার করে ওই রশ্মির সাহায্যে ক্ষুদ্র কণার বিবর্ধন করা সম্ভব। ওই সময় এই বিষয়টি নিয়ে রুসকাও গবেষণা করেছিলেন। আর এই গবেষণা করতে গিয়ে 1933 সালে তিনি তৈরি করে বসলেন এমন একটি মাইক্রোস্কোপ, যাতে ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রন রশ্মি। নতুন উদ্ভাবিত এই মাইক্রোসকোপের নাম দেওয়া হয় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। দেখা গেল, এই মাইক্রোসকোপের বিবর্ধন ক্ষমতা সাধারণ মাইক্রোসকোপের চেয়ে বহুগুণ বেশি। পরে এই মাইক্রোসকোপের অনেক উন্নতি করা হয়েছে। এখন এ ধরনের মাইক্রোসকোপের সাহায্যে অ্যাংস্ট্রম দৈর্ঘ্যের কণাও স্পষ্ট করা দেখা যায়। তোলা যায় ভাইরাসের মত ক্ষুদ্র কণার ছবি। এ ধরনের যন্ত্রের প্রথম স্রষ্টা বলেই নোবেল কমিটি এ বছর পুরস্কৃত করলেন রুসকাকে। রুসকার জন্ম 20 জুলাই, 1906 সালে। ফ্রাঙ্কফুর্টে। শিক্ষা মিউনিখ এবং বার্লিনের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে।

ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে বিনিং এবং রোহ্‌রের তৈরি করেছেন আর এক ধরনের নতুন যন্ত্র। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোসকোপ।' এই যন্ত্রটির সাহায্যে এখন পদার্থের পরমাণুর ছবি দেখাও সম্ভব হচ্ছে। এই কৃতিত্বের জন্যেই তাঁদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বিনিং এর জন্মও ফ্রাঙ্কফুর্টে, 20 জুলাই, 1947। রোহ্‌রের-এর জন্ম সুইটজারল্যাণ্ডের বুকাস শহরে।

1986 তে রসায়ন শাস্ত্রে যুগ্ম নোবেলজয়ী
বাঁদিকে : উয়ানলী, ডানদিকে ঃ ডাড্‌লী হরশব্যাক

রসায়নে যাঁরা পুরস্কার পেলেন, তাদের আবিষ্কারও কম চমকপ্রদ নয়। অনেকেই হয়ত জান, অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি পদার্থ। পদার্থের মধ্যে অণু-পরমাণু সব সময়ই গতিশীল অবস্থায় বিরাজ করে। যেন সব সময়ই তারা ছুটছে। তরল অবস্থায় তাদের ছোটাছুটি বেশি। গ্যাসীয় অবস্থায় আরও বেশি। বিভিন্ন অণু যখন পরস্পর খুব কাছাকাছি হয়, অথবা সংস্পর্শে আসে তখন তাদের মধ্যে ঘটে দুই রকম ঘটনা। এক, কোন একটি পদার্থের অণু অপর একটি পদার্থের অণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে বিশেষ একটি অণু যেমন $2H_2+O_2 \rightarrow 2H_2O$। দুই, দুটি পদার্থের অণুর পরমাণু বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় দুটি নতুন অণু। যেমন, H_2SO_4 (অণু)+Zn (অণু)$\rightarrow ZnSO_4$ (অণু)+H_2 (অণু)। এ ধরনের ঘটনাকের বলে রাসায়নিক বিক্রিয়া। কিভাবে এবং কোন কোন কারণে এ ধরনের বিক্রিয়া ঘটে, তা নিয়ে অতীতে বহু তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এ বছর যাঁরা রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁরাও দাঁড় করিয়েছেন নতুন তত্ত্ব। "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে কত রকম অণু। পরস্পর সান্নিধ্যে এসে কিভাবে তারা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় তাঁদের তত্ত্ব সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা যোগাতে সম্ভব হবে।"—বলেছেন নোবেল কমিটি। তাঁদের গবেষণা রাসায়নিক 'লেজার' তৈরিতেও সাহায্য করেছে।

হেরশবাকের জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ার সান হোসে শহরে, 18 জুন, 1932। 1963 থেকে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক। লী'র জন্ম তাইওয়ানের সিনচু শহরে, 29 নভেম্বর, 1936। 1974 থেকে বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পোলানির জন্ম 23 জানুয়ারি, 1929। 1962 থেকে কানাডার টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

জীবকোষে সৃষ্টি হয় বিশেষ এক শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ, কোষকলার বৃদ্ধি বা বিভিন্ন কোষের বৃদ্ধির ব্যাপারে যারা কাজ করে। এই জীব-রাসায়নিক যৌগগুলিকে বলা হয় "গ্রোথ ফ্যাকটরস্"। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই যৌগগুলিই মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর ভ্রূণকে বড় করে তুলতে সাহায্য করে, শরীরের কোন জায়গা কেটে গেলে, সেই জায়গা জোড়া দেওয়ার জন্যে তৈরি করতে সাহায্য করে নতুন কোষ। এমন কি ক্যানসার কোষ সৃষ্টিতেও তাদের ভূমিকা রয়েছে। এই 'গ্রোথ ফ্যাকটর'-এর রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করেছে 77 বৎসর বয়স্কা লেডি মনতাল-কিনি এবং 63 বৎসর বয়স্ক কোহেন। তাঁদের এই মূল্যবান গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবেই তাঁরা পেলেন এ বছরের নোবেল পুরস্কার। নোবেল কমিটি বলেছেন, "তাঁদের আবিষ্কার বংশগত ত্রুটি, ক্যানসার, পেশীর যন্ত্রণা, মস্তিষ্কের রোগ সহজে যাদের ক্ষত থেকে রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হয় না, তাদের দ্রুত রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে এবং আরও নানান জটিল রোগ নিরাময়ের উপায় যোগাতে সাহায্য করবে।"

সমরজিৎ করের

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ ২০ টাকা

পরিশিষ্টে ১৯০১—১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানে
নোবেল পুরস্কার প্রাপকগণের তালিকা সংযোজিত।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9

পরিবেশ ও আমরা

দীপাঞ্জন মিত্র

1962 খ্রীস্টাব্দের 4ঠা ডিসেম্বর। এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। হঠাৎ বেলা আড়াইটা নাগাদ কর্মব্যস্ত লণ্ডন শহরে নেমে এল ভারী কুয়াশা। লণ্ডন শহরে কুয়াশা কিছু আশ্চর্যের নয়। কিন্তু, সেদিনের সেই কুয়াশার সঙ্গে অন্যান্য দিনের অনেক অমিল। সেই কুয়াশাকে কুয়াশা না বলে ধোঁয়াশা বলাই ভাল। এই ধোঁয়াশা স্থায়ী হয়েছিল প্রায় 5 দিন। কিন্তু, তার মধ্যেই শহরের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আরো কিছুক্ষণ এই ধোঁয়াশা স্থায়ী হলে শহরে আর প্রাণের অস্তিত্ব থাকত না।

সেদিনের এই ধোঁয়াশা কিন্তু অন্যান্য দিনের মত সাধারণ ধোঁয়াশা ছিল না। বহুদিন ধরে কলকারখানায়, যানবাহনে বিভিন্ন জ্বালানী পুড়ে উৎপন্ন নানা ক্ষতিকারক গ্যাস, বিভিন্ন অক্সাইড, কার্বন কণা, আপোড়া হাইড্রো-কার্বনের পরিমাণ বাতাসে বাড়তে বাড়তে বায়ুমণ্ডলের ধারণ ক্ষমতার থেকে বেশী ভারী হয়ে গিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের কাছে নেমে আসে। এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। বহু লোকের শ্বাসকষ্টই হয় নি, কঠিন কণা ও বিভিন্ন রাসায়নিক ধোঁয়া ফুসফুসে যাওয়ায় বুকের রোগে মৃত্যুও হয়েছিল প্রচুর। শুধু সরকারী হিসাবেই মৃত্যু হয়েছিল প্রায় 4315 জনের।

এই ঘটনা বিজ্ঞানী মহলে দ্রুত অগ্রসরমান শিল্প-সভ্যতার ভবিষ্যতের ভয়াবহতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কলকারখানায়, যানবাহনে, রান্নার কাজে জ্বালানী পুড়ে প্রতি মুহূর্তে উৎপন্ন হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে নানা ক্ষতিকারক বিষাক্ত গ্যাস (যেমন—কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি) বিভিন্ন হাইড্রো-কার্বন, নাইট্রোজেন ও সালফারের অক্সাইড, গন্ধকযুক্ত লোহা ও তামার আকরিক শোধনের সময়ও নাইট্রোজেন ও সালফারের অক্সাইড উৎপন্ন হয়। তাছাড়াও, দহন কমাতে পেট্রোলের সঙ্গে মেশানো হয় টেট্রাইথাইল লেড $[(C_2H_5)_4Pb]$ যা পুড়ে গিয়ে তৈরী করে লেডের এক বিশেষ উদ্বায়ী যৌগ। লেডের যৌগটি শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, এমন কি বেশী মাত্রায় মৃত্যুও ঘটাতে পারে। তাহলেই বোঝা যায়, একটা সুসভ্য শহরের নাগরিক প্রতি নিশ্বাসে কি পরিমাণ বিষ শরীরে টেনে নেয়।

বিভিন্ন অধাতব অক্সাইড পরে জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে তৈরী করে বিভিন্ন অ্যাসিড (যেমন—কার্বলিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড)। বৃষ্টির সঙ্গে অ্যাসিড-গুলোও মাটিতে নেমে আসে। এরই নাম 'অ্যাসিড রেইন'। পরিবেশবিদ্‌রা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর শহরের বাতাস যেভাবে দূষিত হচ্ছে, তাতে কয়েক বছরের মধ্যেই ওখানে অত্যধিক অম্লতাযুক্ত অ্যাসিড বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাসিড জলে ও মাটিতে মেশে। ফলে সামগ্রিক জল ও মাটির অম্লতা বেড়ে যায়। বেশী অম্লতার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রগতিশীল বিজ্ঞানের জন্য মানবসভ্যতা আজ বিপন্ন। নানারকম স্প্রে, জেট প্লেনের জ্বালানী পুড়ে উৎপন্ন নানা পদার্থ, রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুরো কারবন প্রভৃতি ওজোনগ্যাসস্তরকে হাল্কা করে দিচ্ছে। পরিবেশের অক্সিজেনের মাত্রা ক্রমশঃ কমার ফলে ওজোনগ্যাস অক্সিজেনে পরিণত হয়ে হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। ওজোনস্তর পৃথিবীকে বিভিন্ন মহাজাগতিক রশ্মি (যেমন—অতি বেগুনী রশ্মি) হতে রক্ষা করে। ওজোনস্তর হালকা হয়ে যাবার ফলে বিভিন্ন মহাজাগতিক রশ্মি বেশী মাত্রায় পৃথিবীর বুকে পড়বে। ফলে ধ্বংস হবে বিভিন্ন মাইক্রো-অর্গানিজম্‌স্‌, ক্ষতিগ্রস্ত হবে উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষ, ক্যানসার রোগ বেড়ে যাবে, আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা দেবে।

একথা ভাবতেও অবাক লাগে যে মানুষই মানুষকে তিলে তিলে হত্যা করছে। মানুষ তার লোভ মেটানর জন্য সৃষ্টি হতে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছে কিন্তু সংরক্ষণ করে নি। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান মানুষ প্রকৃতিকে অবহেলা করেছে, নগর বাড়ানোর জন্য, শিল্প স্থাপনের জন্য বনের পর বন কেটেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে সবুজ উদ্ভিদের সংখ্যা গেছে কমে। সবুজ উদ্ভিদই একমাত্র পারে কার্বনডাই অক্সাইড শুষে নিয়ে পরিবেশে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে। সবুজ উদ্ভিদ নির্বিচারে কাটার ফলে পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণ গেছে কমে। ওদিকে কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ পরিবেশে বেশ বেড়ে গেছে। একটা ছোট্ট উদাহরণেই ঘটনাটা বোঝা যাবে। পরিবেশে অক্সিজেন থাকা উচিত 20·60% কিন্তু, কলকাতায় অক্সিজেন রয়েছে 15% এর কাছাকাছি। অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে—অত্যধিক উষ্ণতা, অকাল বর্ষণ, হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি-কুয়াশা এরই ফলশ্রুতি। কার্বন-ডাই অক্সাইড বেড়ে যাওয়ায় আবহাওয়ার উষ্ণতা গত 100 বছরে প্রায় 4° (চার ডিগ্রী) সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পেয়েছে।

সভ্য মানুষ চাষবাসের উন্নতির জন্য জমিতে জৈব ও অজৈব সার ব্যবহার করে। আগাছা ও ক্ষতিকারক পতঙ্গ দমনে কীটনাশকের ব্যবহার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এর ফলও খুবই খারাপ। DDT বা অন্যান্য কীটনাশক স্প্রে করলে তা বাতাসেও ভাসতে থাকে ও সেই এলাকার

জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। এছাড়াও, ঐ সকল কীটনাশক জলের সঙ্গে মিশে জলকেও দূষিত ও বিষাক্ত করে তোলে। ঐ দূষিত জল মানুষ বা প্রাণী খেলে তারাও পেস্টিসাইডের (কীটনাশকের) বিষাক্ততায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে, কৃত্রিম সার ও কীটনাশকের ব্যবহার জমির ইকো-সিস্টেমকে নষ্ট করে দেয়। কীটনাশকের ব্যবহারে জমিতে অবস্থানকারী বিভিন্ন মাইক্রোঅর্গানিজম্‌স্‌ও (প্রোটোজোয়া, ব্যাকটিরিয়া, ক্ষুদ্র ছত্রাক ইত্যাদি) অপকারী পতঙ্গের সঙ্গে মারা যায়। ফলে, যে প্রাকৃতিক চক্র জমিতে আবর্তিত হচ্ছিল তা নষ্ট হয়ে যায়, জমির জৈব-অজৈব পদার্থের ভারসাম্য, স্বাভাবিক ক্ষমতা কমতে থাকে।

নির্বিচারে বন ও বন্যপ্রাণী সংহারের ফলেও মানুষ অজান্তে সে স্থানের ইকোসিস্টেম ভেঙে দেয়। কোন অঞ্চলের ইকোলজি নষ্ট হলে মানুষও তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন কি সে লুপ্ত হয়েও যেতে পারে। পরিবেশে জড় ও জীবিতের আদান প্রদানের মাধ্যমে যে অনুকূল বসবাসনীতি গঠিত হয়, তাই ইকোসিস্টেম। কিন্তু মানুষের কৃত্রিমতা প্রাকৃতিক নীতিকে বিপন্ন করে। যেমন সবুজ উদ্ভিদই পারে একমাত্র প্রকৃত খাদ্য তৈরী করতে। অন্য সবাই খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে সবুজ উদ্ভিদেরই উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল। তাই, সবুজ উদ্ভিদ ক্রমশঃ কাটার ফলে খাদ্যের উৎপাদনও কমছে। তাছাড়া পরিবেশ হতে যে মৌলগুলি নিয়ে জীবদেহ হয়, বিভিন্ন মাইক্রো-অর্গানিজমস্‌ (প্রোটোজোয়া, ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি) দ্বারা মৃত জীবদেহ ও জীবদেহের রেচন ও বর্জ্য পদার্থ সংশ্লেষ ও পচনের (Decomposition) মাধ্যমে তা আবার পরিবেশেই ফিরে আসে। ফলে, পরিবেশে জড় ও জীবিতের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। মানুষ ঐ সকল মাইক্রো-অর্গানিজমস্‌ ধ্বংস করলে মৌলের ঘাটতি পূরণের চক্রটি নষ্ট হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট হয়। মানুষও প্রকৃতিরই একটা অংশ ও একই চক্রে গাঁথা। চক্রের একটা অংশ ভেঙে পড়লে সমস্ত চক্রটাই তো ভেঙে পড়বে।

শুধু কীটনাশকেই জল দূষিত হয় না। ইনডাসট্রিয়াল কেমিক্যালসও জল দূষণে অংশ নেয়। বিভিন্ন কল-কারখানার দূষিত বর্জ্য রাসায়নিক দ্রব্যগুলো কাছের জলের সঙ্গে মিশে জলকে দূষিত করে তোলে। জলের অত্যধিক ব্যবহারে, নোংরা জলকে শুদ্ধ না করেই নদীতে ফেলাতে ও যন্ত্রচালিত জলযান হতে উৎপন্ন নানারকম তেল ও গ্যাস জলে মেশাতে জল দূষিত হয়। জল দূষিত হলে জলে মাছের পরিমাণ কমে, দূষিত জল হতে রোগের ব্যাপক সংক্রমণও ঘটে।

পরিবেশ দূষণের আরেকদিক হল শব্দ দূষণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, শ্রবণযোগ্য শব্দের মাত্রা 20—60 ডেসিবল হওয়া উচিত। সেখানে, কলকাতায় সন্দের মান 80—100 ডেসিবল। কলকারখানায় আরো বেশী। অত্যধিক শব্দে বধিরতা, মানসিক রোগ, হৃদরোগ দেখা দেয়, এমনকি পাগল হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

এছাড়াও, বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ, পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য যে যে তেজস্ক্রিয় রশ্মির সৃষ্টি হয় তাও পরিবেশকে দূষিত করে তোলে, তেজস্ক্রিয় রশ্মি হতে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, তেজস্ক্রিয় রশ্মি কোষের জিনমজ্জাকে ভেঙে নতুন জিনমজ্জা গঠন করে অর্থাৎ এককথায় কোষের মিউটেশান ঘটায়। এ ধরনের মিউটেশন জীবিত কোষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর ফলে যেমন ক্যান্সার রোগ দেখা দেয় তেমনি বিকৃতাঙ্গ, বুদ্ধিহীন সন্তান জন্মেরও আশঙ্কা থাকে। আরো ভয়ের কথা, তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত বাহিত হতে পারে।

পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগের একটি প্রধান ও ভয়াবহ সমস্যা। পরিবেশবিদ্‌দের ধারণা, বর্তমানে যে হারে দূষণ চলছে তাতে শীঘ্রই পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব লোপ পাবে। বর্তমান পরিসংখ্যান হতে জানা যায় প্রায় সব মানুষই নানা রোগে আক্রান্ত, শিশুমৃত্যু ও অকালমৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী। এর একমাত্র কারণ দূষিত পরিবেশ, অক্সিজেনের অভাব, জলে-বায়ুতে নানা বিষাক্ত দ্রব্যের উপস্থিতি। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এই হারে পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হিসাবে গুণোত্তর হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান পৃথিবীতে 100 জন মানুষে 2 জন জন্মাচ্ছে। শুধুমাত্র ভারতেই 2000 খ্রীস্টাব্দে লোকসংখ্যা হবে প্রায় 100 কোটি। এই বিপুল জনসংখ্যার চাপ মেটাতে বন কেটে নগর বাড়াতে হচ্ছে, চাষের জমি ভরাতে হচ্ছে। ওদিকে, খাদ্যের পরিমাণ বাড়াবার জন্য অত্যধিক চাষের প্রয়োজন মেটাতে সীমিত জমির উপর চাপ বেড়ে চলেছে। ফলে, জমির সাধারণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ না করে পরিবেশ দূষণ রোধ করা কখনই সম্ভব নয়।

পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সকলকে জানানোর জন্য, সচেতন করার জন্য প্রতি বছর 5ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য বিভিন্ন আইনও করা হয়েছে। কিন্তু, শুধু আইন করে জনসাধারণকে সচেতন করা রায় না, এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক কর্মসূচির। প্রত্যেক মানুষকে পরিবেশ সম্বন্ধে শিক্ষিত করতে হবে। সকলকে এজন্যে এগিয়ে আসতে হবে, প্রত্যেককে নিজের নিজের পরিবেশ রক্ষা করতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে—যা ভুল হবার তা হয়ে গেছে, কিন্তু নতুন করে যেন সেই ভুল আর না হয়। তবেই কেবলমাত্র আবার সুস্থ সুন্দর এক পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব।

335 লেক টাউন, ব্লক এ, কলকাতা-89

প্রাণী বিচিত্রা

শৈল চক্রবর্তী

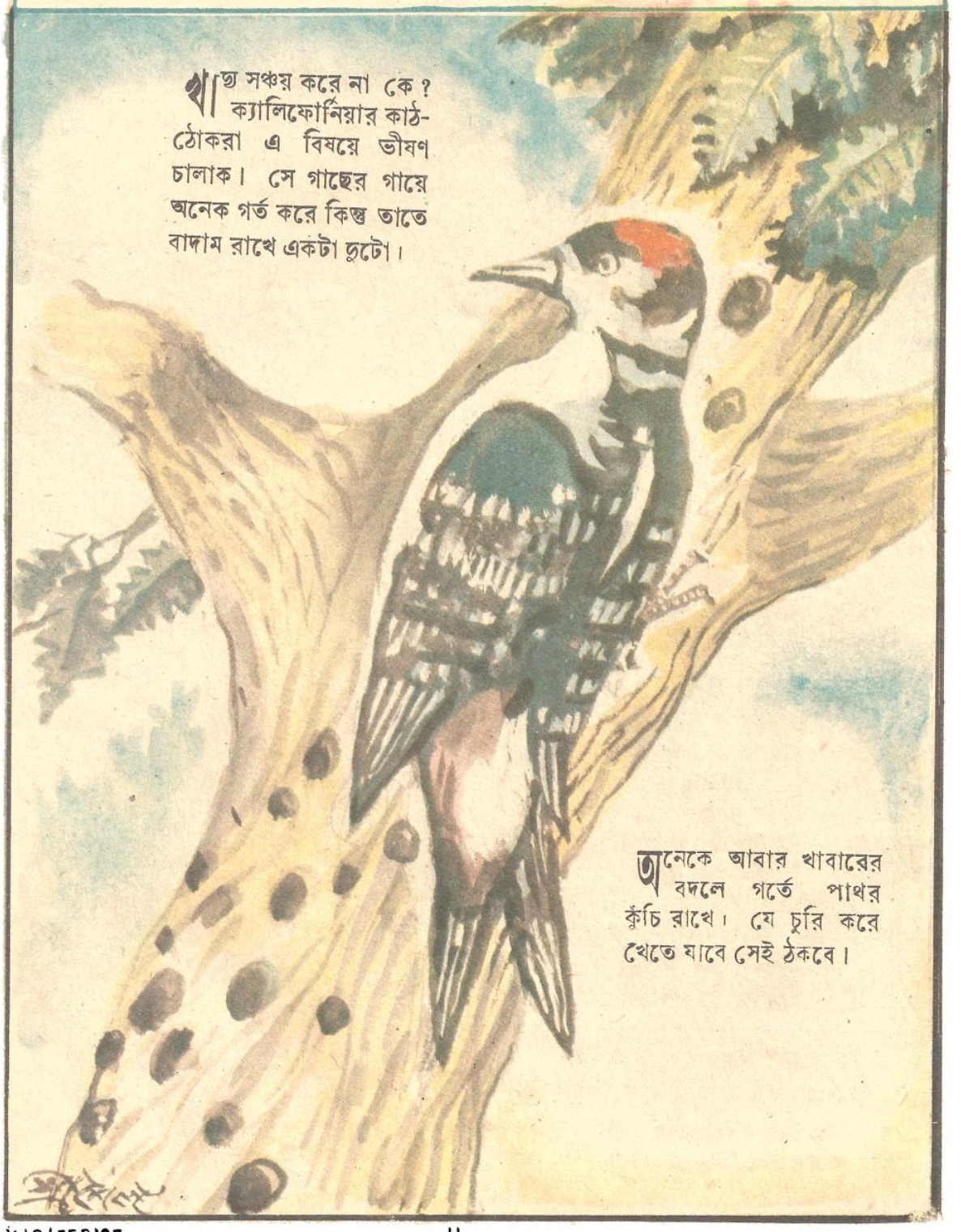

খাদ্য সঞ্চয় করে না কে? ক্যালিফোর্নিয়ার কাঠ-ঠোকরা এ বিষয়ে ভীষণ চালাক। সে গাছের গায়ে অনেক গর্ত করে কিন্তু তাতে বাদাম রাখে একটা দুটো।

অনেকে আবার খাবারের বদলে গর্তে পাথর কুঁচি রাখে। যে চুরি করে খেতে যাবে সেই ঠকবে।

ক্যুইজ কনটেস্ট

ফেব্রুয়ারী 1987 মান : IX—X

1. কোন্ শহরকে 'ভেনিস অব দ্যা নর্থ' বলা হয় ?
2. কোন্ দেশকে 'শ্বেতহস্তীর দেশ' বলা হয় ?
3. 'হোয়াইট হাউসে' প্রথম কোন্ রাষ্ট্রপতি বাস করেছিলেন ?
4. সাঁচী স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন কে ?
5. কোন্ সালে টাইটানিক জাহাজটি ডুবে যায় ?
6. জওহরলাল নেহেরুর মায়ের নাম কি ছিল ?
7. ভারতের কোথায় 'আর্টেজিও কূপ' আছে ?
8. 'অফসেট প্রিন্টিং' এর আবিষ্কর্তা কে ?
9. ATS বলতে কি বোঝায় ?
10. হরিনাথ দে কে ছিলেন ?
11. ভারতের তৃতীয় পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের নাম কি ?
12. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় কোন্ বিদেশী দূত

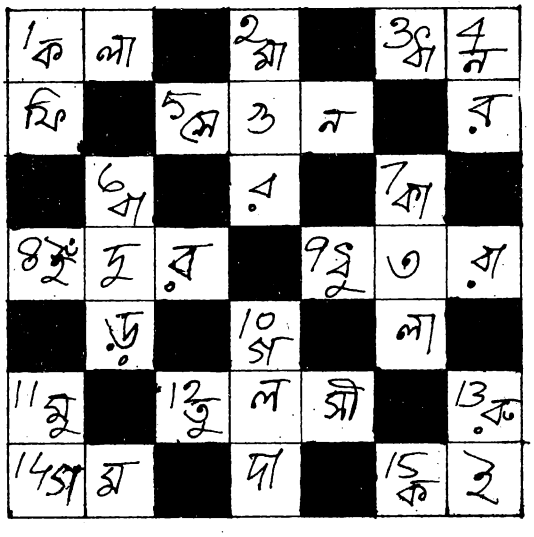

ফটো ক্যুইজ

ফেব্রুয়ারী 1987 মান : IX—X

নিচের ছবিটি একটি বিরল পাখির। লুপ্তপ্রায় এই পাখির সংখ্যা কমতে কমতে সারা বিশ্বে এখন দাঁড়িয়েছে 50। পাখিটির নাম জানো ?

ডিসেম্বর 1986 সংখ্যায় প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টের সমাধান

1. রিয়াধ। 2. রোধাঙ্কের একক। 3. সংবাদপত্রের মালিক, সাংবাদিক এবং প্রকাশক। 4. বজ্রাসন। 5. শতদ্রু নদীর উপর নির্মিত 'ভাকরা বাঁধ'। 6. উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 7. এক গ্যালন বা 4·54 লিটার। 8. ক্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস। ঐ পরমাণুর K কক্ষে 2টি, L কক্ষে 8টি এবং M কক্ষে 7টি ইলেকট্রন আছে। 9. নিস্‌লদানা 10. ক্ষয়জাত পর্বত।

ডিসেম্বরে প্রকাশিত সিনিয়র ফটোক্যুইজের সমাধান : ম্যাপ্‌ল গাছ

মিকি ডোনাল্ডের গল্প

রবিবার সকালবেলাটা এখন জিজার ভারি দুঃখ। আগে ন'টা বাজতে না বাজতেই মিকি ডোনাল্ড দেখবার অজুহাতে বেশ টিভির সামনে বসে পড়া যেত—পড়াশুনার পাট চুকিয়ে সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ হল 'মিকি ডোনাল্ড' দেখানো বন্ধ হয়ে গেছে। মুখ চুন করে ঘুর ঘুর করছিল আমার টেবিলের কাছে। ডেকে বললাম 'গল্প শুনবি, আয়।' লাফিয়ে উঠে জিজা বলল 'মিকি ডোনাল্ডের গল্প বল'। বললাম 'তার থেকে মিকি ডোনাল্ড কি করে প্রথম তৈরি হল তার গল্প শোন।'

'মিকি ডোনাল্ড'এর ধরনের ছবিকে অ্যানিমেশন কার্টুন ছবি বলে। উইন্সর ম্যাকে ব'লে একজন ভদ্রলোক ভাবলেন যদি কোন একটা ঘটনার অনেকগুলো ছবি না তুলে অনেকগুলো ছবি আঁকা যায়, তবে কেমন হয়। এইভাবেই তৈরি হ'ল প্রথম অ্যানিমেশন ছবি 'লিটল নিমো'—তখন সময় 1910 সাল। অ্যানিমেশন ছবি আর ছায়াছবির ধরনটা আসলে এক। ধর, কেউ হাঁটছে—এই হাঁটাটাকে টুকরো টুকরো করে নানানভাবে ভেঙে দেখানো আর কি। পরপর এই টুকরোগুলো জুড়ে দিলেই মনে হবে কেউ হেঁটে যাচ্ছে।

থ্যামাট্রোপ, অ্যানিমেশন ছবি তৈরির গোড়ার দিকের একধরনের যন্ত্র। একটা কার্ডবোর্ডের চাকতি—যার দু'দিকে ছবি আঁকা। একটা তার বেঁধে তাড়াতাড়ি ঘোরালে দুটো মিশে একই ছবি মনে হবে বা প্র্যাক্সিনোস্কোপে একটা গোল লাটিমের গায়ে ছবি আঁকা থাকত। আয়নার সামনে লাটিমটা ঘুরলে প্রতিফলনে মনে হ'ত ছবিটা নড়ছে।

খুব তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে যাওয়া একধরনের বইও হ'ত, দ্রুত পাতা উল্টে গেলে মনে হতো ছবিটা নড়ছে।

অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ

অনেকটা ঘন লোমে ঢাকা পুষী বিড়ালের মত দেখতে, হাত দেড়েক লম্বা, নম্র স্বভাবের লোরিস্ (Loris) লজ্জাবতী বানর নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক নাম **লোরিস টার্ডিগ্রেডাস (Loris tardigradus)**। পাওয়া যায় ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের গভীর অরণ্যে এবং বাংলাদেশের পাহাড়ী জঙ্গলে। এরা সাধারণত নিশাচর। রাত্রে পোকামাকড়, ফলমূলের খোঁজে বেরোয় আর দিনের বেলায় বলের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোয়। খাবার হিসাবে গঙ্গাফড়িং এদের ভারি পছন্দ। এরা খুব শক্তভাবে গাছের ডালকে জড়িয়ে ধরে রাখে। অনেক সময় পা শক্ত করে গাছের ডালকে ধরে মাথা নিচু করে ঝুলতে থাকে এবং এই ঝুলন্ত অবস্থাতেই হাত দিয়ে খাবার ধরে থাকে বা দরকার হলে ঐ ভাবে ঝুলতে ঝুলতে গাছের ফোকরে জমে থাকা জল পান করে। কিন্তু কখনই পা ফসকে পড়ে যায় না। এদের মুখের মধ্যে বড় বড় গোল চোখ দুটো বিশেষ আকর্ষণীয়। দেখলে মনে হয় যেন চোখসর্বস্ব মুখ। ভয় পেলে হয় গাছের এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে পালায় অথবা এক জায়গায় নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন এক থোকা মসৃজাতীয় উদ্ভিদ।

যদিও খানিকটা বিড়ালের মত দেখতে আসলে এরা লেমুর গোত্রের বানর জাতীয় প্রাণী। তবে এদের কোন লেজ নেই এবং হাতের তর্জনী **(index finger)** ক্ষয়প্রাপ্ত। এই দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য এরা লেমুরদের থেকে স্বতন্ত্র।

লোরিস কেবলমাত্র ভারতবর্ষ, সিলোন এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। আফ্রিকায় লোরিসের মত দেখতে আর এক ধরনের নিশাচর প্রাণী আছে নাম 'পোটো' **(Perodicticus potto)**। এদেরও তর্জনী ক্ষয়প্রাপ্ত তবে এদের দু' আড়াই ইঞ্চি লম্বা লেজ থাকে।

কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীকে তখনই বিপদগ্রস্ত বলা হয় যখন দেখা যায় স্বাভাবিক পরিবেশে তারা একান্ত বিরল হয়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষভাবে ব্যাপক প্রাণিহত্যা ও পরোক্ষভাবে অরণ্য উচ্ছেদ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ায় ভারতের বহু প্রাণী আজ বিপদগ্রস্ত প্রাণীর তালিকাভুক্ত। 1972 সালে ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা হয় এবং বিপদগ্রস্ত ও সংরক্ষিত বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের তালিকা তৈরি করা হয়। এই তালিকায় লোরিসের নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৯৮৭'র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

জীবনবিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

দিনোজকুমার দে

1. শ্বেতসারের মৌলিক উপাদানগুলি কি কি এবং উদ্ভিদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া সালোকসংশ্লেষ করে? সালোকসংশ্লেষের আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়াটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কি কি উপাদানের প্রয়োজন? এই প্রক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণটি লিখ। এই প্রক্রিয়াটি কোন্ কোন্ প্রভাবক দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়? কি ভাবে ও কোন্ উপাদান হইতে অক্সিজেন বাহির হয়?

2. নিশ্বাস প্রশ্বাস ও শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য কি? শ্বসনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। অবাত ও সবাত শ্বসনের মূল পার্থক্যগুলি কি কি? শ্বসনকার্যে গ্লাইকেলিসিস প্রক্রিয়ার তাৎপর্য কি? কি কারণে পরিশ্রম করিলে শ্বাসকার্যের হার বৃদ্ধি পায়? শ্বাসকার্যের সময় কিভাবে গ্লুকোজ জারিত হয়? কোহল সন্ধান কি? কোহল সন্ধানের সহিত অবাত শ্বসনের পার্থক্য কি? প্রাণিদেহে অবস্থিত তিনটি শ্বাস-অঙ্গের নাম কর। সালোকসংশ্লেষ ও শ্বাসকার্য দুইটি প্রক্রিয়া দিনের বেলা কি ভাবে একই সঙ্গে ঘটে।

3. a) উৎসেচক কাহাকে বলে? উৎসেচকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? অ্যামাইলোলাইটিক, প্রোটিওলাইটিক ও লাইপোলাইটিক উৎসেচক বলিতে কি বোঝ? নিম্নলিখিত উৎসেচকগুলির উৎস কি? ইহারা কোন খাদ্য বস্তুর উপর কার্য করে তাহা লিখঃ a) লাইপেজ b) ট্রিপসিন c) অ্যামাইলেজ d) পেপ্সিন। মৌলিক উপাদান ও স্বল্প মৌলিক উপাদানের মধ্যে পার্থক্য কি? যে কোন চারটি অধাতব মৌলিক উপাদানের নাম কর এবং উহাদের কার্যকারিতা উল্লেখ কর। Ca, P, Mg, K,Fe,ও I- প্রাণীদেহে এই খনিজ পদার্থগুলির প্রয়োজনীয়তা কি ও ইহাদের উৎস কি? b) ভিটামিন কি? তোমার পরিচিত ভিটামিনগুলির নাম লিখ। ভিটামিনগুলির উৎস এবং অভাবজনিত রোগের লক্ষণগুলি উল্লেখ কর। মানবদেহে কোন্ কোন্ ভিটামিনের সংশ্লেষ সম্ভব? পুষ্টি কাহাকে বলে? প্রাণী পুষ্টির পর্যায়গুলি কি কি? পর্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ও প্রতিটি পর্যায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলির নাম লিখ। খাদ্য কতপ্রকার? প্রত্যেক প্রকার খাদ্যের একটি করিয়া উদাহরণ দাও। প্রোটিন, শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য প্রাণীদেহে কি অবস্থায় শোষিত হয়?

4. a) কোষ রসের উৎস্রোত কাহাকে বলে? কোন্ কলার মধ্য দিয়া রসের উৎস্রোত ঘটে এবং কোন কলার মধ্য দিয়া খাদ্য সংবহন ঘটে। বাষ্পমোচন এবং শোষনের সহিত কোষ রসের উৎস্রোতের সম্পর্ক কি? উদ্ভিদ দেহে জলও খাদ্য সংবহনের বর্ণনা দাও।

b) বিশুদ্ধ রক্ত কাহাকে বলে? রক্তের উপাদানগুলি কি কি? রক্তের কাজগুলি কি কি? রক্তের রঙ লাল কেন? রক্তের কয়টি শ্রেণী ও কি কি? মানবরক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমান কত? হিমোগ্লোবিন কমিয়া যাওয়ার কারণ কি? রক্তস্তন্ধন কি ভাবে হয়? এ্যান্টিজেন ও এ্যান্টিবডি কি? লসিকা কি? লসিকার কার্য কি? সংবহন কাহাকে বলে? সংবহনের প্রয়োজনীয়তা কি? ফুসফুস, বৃক্ক, ক্ষুদ্রান্ত্র ও চর্মের মধ্যদিয়া যখন রক্ত প্রবাহিত হয় তখন অঙ্গগুলি হইতে রক্ত কি গ্রহণ করে এবং কি বর্জন করে।

ঐচ্ছিক জীবনবিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী আলোচনা করা হবে আগামী সংখ্যায়

5. a) অ্যামিবা, কেঁচো, আরশোলা ও মাছের গমন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

b) সঞ্চালন ও চলনের মধ্যে পার্থক্য কি? চলনের উদ্দেশ্য কি? সাইক্লোসিস কি? প্রাণীকোষে কি সাইক্লোসিস দেখা যায়? ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলনের পার্থক্য কি? বিভিন্ন প্রকার চলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

6. a) নেফ্রন কি? উহার চিত্র অঙ্কন করিয়া বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর এবং প্রতিটি অংশের কার্য উল্লেখ কর। প্রাণীদের রেচন দ্রব্যগুলি কি কি! কেঁচো ও ফড়িং-এর রেচন প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। রেচন কার্যে ত্বক, যকৃৎ ও ফুসফুস কি ভাবে সাহায্য করে? মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রধান রেচন অঙ্গ কি? ঐ অঙ্গটির অবস্থান ও কার্য উল্লেখ কর। উদ্ভিদ ও প্রাণী রেচনের পার্থক্যগুলি কি কি?

7. a) মৃত্তিকার উৎপত্তি হয় কিভাবে? উৎপত্তি অনুসারে মৃত্তিকা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও। মাটির প্রধান উপাদানগুলি কি কি? উপাদানের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং বিভিন্ন শস্যাদির নাম কর।

b) মাইক্রোব্স কি? ব্যাকটেরিয়ার গঠন, আকৃতি ও জনন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও। ব্যাকটেরিয়ার উপকারী ও অপকারী ভূমিকা আলোচনা কর। তিনটি ভাইরাস ও তিনটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের নাম কর।

8. একটি নিউরোনের চিত্র অঙ্কন করিয়া বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও। নিউরোনের কার্য কি? মানুষের নার্ভতন্ত্রের অংশগুলি কি কি? মানুষের মস্তিষ্কের চিত্র অঙ্কন করিয়া বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও। প্রান্তসন্নিকর্ষ কি? স্নায়ু স্পন্দন আদান প্রদানে প্রান্তসন্নিকর্ষের ভূমিকা আলোচনা কর। জ্ঞানেন্দ্রিয় কাহাকে বলে? জ্ঞানেন্দ্রিয় কয়টি ও কি কি? মানুষের চক্ষুর লম্বচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন করিয়া বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। চিত্রের সাহায্যে মানবকর্ণের গঠন আলোচনা কর।

9. a) অক্সিন কি? কত প্রকারের? তাহাদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য কি? অক্সিন কোথায় উৎপন্ন হয় ও কি ভাবে কার্য করে? হরমোন কাহাকে বলে? কৃষিকার্যে হরমোন কি ভাবে ব্যবহৃত হয়?

b) অনালগ্রন্থি কাহাকে বলে? প্রাণীদেহে তিনটি অনালগ্রন্থির নাম, অবস্থান, নিঃসৃত হরমোনের নাম ও উহাদের কার্য বর্ণনা কর। নিম্নলিখিত হরমোনগুলির অভাব কি হয়ঃ i) থাইরক্সিন ii) ইনসুলিন iii) অ্যাড্রিনালিন।

10. মাইটোসিসকে সমবিভাজন ও মায়োসিসকে হ্রাস বিভাজন বলা হয় কেন? উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের কোন অংশে মাইটোসিস ও কোন অংশে মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন হয়? একটি উদ্ভিদ ও একটি প্রাণীকোষের মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিজ্ঞানের চিত্র অঙ্কন কর। মাইটোসিস ও মায়োসিস কোষ বিভাজনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। সাইটোকাইনেসিস কখন ঘটে? ক্যায়াসমা, বাই-ভালেণ্ট ও ক্রসিংওভার কি ও কখন দেখা যায়? মায়োসিস কোষ বিভাজনে ক্যায়াসমার তাৎপর্য কি? সেণ্ট্রোমিয়ার কাহাকে বলে? মাইটোসিস ও মিয়োসিসের পার্থক্য কি?

11. বৃদ্ধি কাহাকে বলে? বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি কি কি? উদ্ভিদ ও প্রাণী বৃদ্ধির পার্থক্যগুলি কি কি? জীবের বৃদ্ধির সহিত জননের সম্পর্ক কি? উদাহরণ সহ বিভিন্ন প্রকার অঙ্গজ জনন পদ্ধতি আলোচনা কর। চিত্র সহ একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন পদ্ধতি বর্ণনা কর। নিষেক কাহাকে বলে? আমরা কোন উদ্দেশ্যে উদ্ভিদের অঙ্গজ জনন এবং যৌন জনন পছন্দ করি? অযৌন জনন ও যৌন জননের প্রধান পার্থক্য কি। জীবের জীবন চক্রে যৌন জননের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

12. বংশগতি কাহাকে বলে? বংশগতিতে 'সংকর' ও 'খাঁটি এবং 'প্রবলগুণ' ও 'প্রচ্ছন্নগুণ' কথার অর্থ কি? এক সংকর জনন কাহাকে বলে? মেণ্ডেলের এক সংকর জনন চেকার বোর্ডের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। ইহা হইতে কি মন্তব্য করা যায়? মেণ্ডেলের একটি মতবাদ এক সংকর জননের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। এক সংকর জননের 3 : 1 অনুপাত কখন পাওয়া যায় না? উদাহরণ দাও। কৃষির উন্নতিতে সংকরায়ন পদ্ধতির ভূমিকা আলোচনা কর।

13. পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব কি ভাবে হয়েছিল। অভিব্যক্তি বলিতে কি বোঝ? জৈব অভিব্যক্তিবাদের স্বপক্ষে প্রমাণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ল্যামার্ক ডারউইনের মতবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। জীবাশ্ম বলিতে কি বোঝ? লুপ্তপ্রায়-অঙ্গ ও মিউটেশন কি?

14. নিম্নলিখিত উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলির অভিযোজন উল্লেখ কর ঃ i) সুন্দরী গাছ ii) ফণিমনসা গাছ iii) মটর গাছ iv) কই v) মাগুড় vi) সিঙ্গি ও vii) রুই মাছ।

15. ইকোসিস্টেম কাহাকে বলে? একটি পুকুরের বাস্তুরীতি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও। একটি ইকোসিস্টেমে কতগুলি উপকরণ দেখা যায়? বাস্তুরীতিকে শক্তির প্রধান উৎস কি? একটি বনভূমির খাদ্য শৃঙ্খলের বর্ণনা দাও।

16. সংরক্ষণ কাহাকে বলে? বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি। পশ্চিমবঙ্গে কয়টি অভয়ারণ্য আছে? কোন্ কোন্ অভয়ারণ্য কি কি প্রাণীর জন্য বিখ্যাত? ব্যাঘ্র সংরক্ষণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ কর।

17. বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য কোন কোন্ প্রক্রিয়ায় বজায় থাকে? ঐ প্রক্রিয়াগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। উদ্ভিদ সরাসরি বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে না কেন?

18. নিম্নলিখিত বিজ্ঞানিগণ কি কারণে বিখ্যাত ঃ
a) লুই পাস্তুর b) গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল c) ডে-প্রিস d) ল্যামার্ক e) ডারউইন। f) চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর ঃ—
i) একটি সম্পূর্ণ ফুল ii) মুক্ত ও বদ্ধ সংবহনের চিত্র iii) ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ iv) কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক নালী v) একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্র।

20. পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য দেখাও ঃ—
অ) আলোক বিক্রিয়া ও অন্ধকার বিক্রিয়া আ) ফোটোলিসিস ও গ্লাইকোলিসিস ই) সবাত শ্বসন ও দহন ঈ) সালোক সংশ্লেষ ও শ্বাসকার্য উ) স্বভোজী ও পরভোজী ঊ) উৎসেচক ও হরমোন ঋ) মুক্ত ও বদ্ধ সংবহন ৯) উপক্ষার ও তরুক্ষীর এ) ক্রোমোজোম ও ক্রোমাটিড ঐ) জিব্বারেলিন ও কাইনিন ও) উৎপাদক ও বিয়োজক ঔ) গুরুমস্তিষ্ক ও লঘুমস্তিষ্ক ক) অভিস্রাবন ও ব্যাপন খ) ইনসুলিন অ্যাড্রিন্যালিন গ) ভিটামিন ও অক্সিন ঘ) লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকা ঙ) ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া চ) ভিটামিন ও উৎসেচক ছ) ট্রপিক ও ট্যাকটিক চলন জ) পরজীবী ও মৃতজীবী ঝ) উপচিতি ও অপচিতি ঞ) শিরা ও ধমনী ট) জাইলেম ও ফ্লোয়েম ঠ) পরিপাক ও আত্তীকরণ ড) উৎপাদকজীব ও খাদক জীব ঢ) অ্যাক্সন ও ডেনড্রন ণ) লিম্ফোসাইট ও থ্রম্বোসাইট ত) ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ থ) আবর্তন ও পরিবেষ্টন।

21. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—
i) অপুংজনি ii) সাইটোকাইনেসিস iii) STH. iv) প্রস্বেদন v) উপকারী ছত্রাক vi) জাইলেম vii) সিটা viii) খাদ্য শৃঙ্খল ix) সুষমখাদ্য x) আকর্ষ xi) সংকরায়ন xii) যৌন দ্বিরাপতা xiii) অন্তঃকর্ণ xiv) ব্যাকটিরিওফাজ xv) জোড় কলম xvi) সেণ্ট্রোমিয়ার xvii) গ্রুপ 'o' xviii) অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র xix) হিউমাস xx) স্বারদকোরক xxi) প্রতিবর্তক্রিয়া xxii) হিমোগ্লোবিন xxiii) তরুক্ষীর xxiv) শারীর বৃত্তীয়ভাবে শুষ্ক মৃত্তিকা xxv) পেরিস্টল্‌সিস xxvi) বায়োমাস xxvii) সঙ্গীকোষ xxviii) ত্রিপত্র কপাটিকা xxix) রেটিনা xxx) অমরা।

1987 মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

জ্যামিতির উত্তর সম্পর্কে আলোচনা

ডঃ অসীম মুখোপাধ্যায়

যুক্তিশীল মনন গঠনে সমগ্র গণিতের মধ্যে জ্যামিতি শাস্ত্রের অবদান সর্বাপেক্ষা বেশি। শাস্ত্রটির বিষয়বস্তুর উপস্থাপন পদ্ধতির মধ্যে যে স্বতন্ত্রতা আছে সেটি ঠিকমত উপলব্ধি করতে না পারলে জ্যামিতি পাঠ নিরর্থক। জ্যামিতি শাস্ত্রের কাঠামোর বিভিন্ন অঙ্গের বৈশিষ্ট্য হলো—

(1) কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ বা গৃহীত সত্য নিয়ে শুরু করা,

2) স্বতঃসিদ্ধগুলির প্রয়োগে নতুন তথ্যের অবতারণা, যেগুলির পুনঃ প্রয়োগে আরও নতুন তথ্যের আবিষ্কার। এই জ্যামিতিক তথ্যগুলিকে বলা হয় উপপাদ্য। অনুসিদ্ধান্ত।

3) জ্যামিতিক ফলাদি প্রয়োগে জ্যামিতিক চিত্রাদি অঙ্কন পদ্ধতির নির্দেশ। এই অঙ্কন পদ্ধতিগুলিকে বলা হয় সম্পাদ্য।

এই শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট ফরাসী দার্শনিক বেনেভিক্ট দ্য স্পিনোজা (Spinoga) তাঁর দর্শন তত্ত্বকে জ্যামিতিক ছাঁচে লিখেছিলেন। এই শতাব্দীর এক বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যেরও তাঁর 'নব জ্যামিতিক সেট' ঠিক যেন একটি উপপাদ্যের প্রমাণ।

স্বতঃসিদ্ধ নির্বাচন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, কারণ এর ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে সমগ্র শাস্ত্রটি। এগুলি অন্তর্বিরোধী হবে না, সংখ্যায় কম হবে, দ্ব্যর্থহীন, স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। মাধ্যমিক স্তরে যে জ্যামিতি পড়ান হয় সেটি আলেকজেন্দ্রিয়া নিবাসী গ্রীক গণিতবিদ্ ইউক্লিড (330 খ্রীঃ পূর্বঃ) রচিত। যে পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধ এই জ্যামিতির ভিত্তিস্বরূপ, সেগুলি হলো—

i. দুটি বিন্দু দিয়ে কেবল একটি সরল রেখা আঁকা যায়,

ii. দিক অপরিবর্তিত রেখে যে কোনো রেখাংশকে উভয় প্রান্ত থেকে যথেচ্ছ এবং অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত করা যায়,

iii. যে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে এবং যে কোনো দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকা যায়,

iv. সকল সমকোণ সমান,

এবং v. একটি সরল রেখার বহিঃস্থ যে কোনো বিন্দু দিয়ে সেই সরল রেখার সঙ্গে সমান্তরাল করে একটি মাত্র সরল রেখা আঁকা যায়।

বলাবাহুল্য, উপরিউক্ত স্বতঃসিদ্ধগুলির পরিবর্তন সাধনে যে নতুন জ্যামিতির সৃষ্টি হবে তা অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি।

প্রতিটি উপপাদ্যের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ পর্ব আছে। সেগুলি হলো—(1) উপপাদ্যের বিবৃতি (2) চিত্র (3) বিশেষ নির্বাচনে (4) অঙ্কন (5) প্রমাণ ও (৬) উপসংহার।

দুঃখের বিষয় যে এত যুক্তিশীল বিষয়টির উত্তরদানে পরীক্ষার্থীরা আদৌ পারদর্শী নয়। উত্তর মানের ছাত্র-ছাত্রীরাও খুবই কম সংখ্যক পরীক্ষকের সন্তুষ্টি বিধানে সমর্থ হয়। সন্তুষ্ট না হলে কোনো কোনো পরীক্ষক ত্রুটির গুরুত্ব বুঝে কিছু নম্বর কেটে নেন, আবার কেউ কেউ শাস্ত্রটির প্রতি নিষ্ঠা জ্ঞাপনার্থে কোনো নম্বরই দেন না। তাই প্রতি পরীক্ষার্থীর মনে রাখা দরকার যে জ্যামিতির উত্তর যেন নিখুঁত হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা খাতায় কি ধরনের ভুলভ্রান্তি করে এবং সেজন্য কেমন নম্বর কাটা যেতে পারে এ নিবন্ধে সেই বিষয় কিছু সর্তকতামূলক আলোচনা করা হবে।

বিবৃতিতে ভুল—খাতায় প্রমাণিতব্য উপপাদ্যের বিবৃতি লেখার প্রয়োজন নেই, কারণ এটি প্রশ্নপত্রেই থাকে এবং প্রশ্ন নম্বরটি উল্লেখই যথেষ্ট। কিন্তু যদি কোনো উপপাদ্যের বিবৃতি লিখতে বলা হয় তাহলে বিবৃতিটি না দিলে ঐ অংশের জন্য বণ্টিত নম্বর কাটা যাবে। বিবৃতি সম্পর্কে প্রায় সব পরীক্ষকই একমত যে বিবৃতি হবে 'সম্পূর্ণ নিখুঁত' ; তার জন্য পাঠ্য পুস্তকের ভাষাই যে লিখতে হবে তার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। বক্তব্য এই যে বিবৃতির ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের বয়ানই পরীক্ষার খাতায় লেখা উচিত,।

চিত্রে ভুল—চিত্র নির্ভর যে কোনো উত্তরে চিত্র অপরিহার্য ; চিত্রের হরফের সংগে প্রমাণ পর্বে কোনো বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হলে সব পরীক্ষকই নম্বর দানে বিরত থাকেন। তাই অঙ্কনে এবং প্রমাণে উল্লিখিত সব কিছুই সম্পর্ণভাবে চিত্রে থাকতে হবে। প্রায় সময় প্রশ্নের বয়ানে ব্যবহার্য হরফ দেওয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে সেই হরফাদি মেনে উত্তর করতে হবে, অন্যথায় কোনো নম্বরই পাওয়া যাবে না। কোনো রেখা বা বৃত্ত আঁকতে হলে অবশ্যই স্কেল এবং কম্পাস ব্যবহার করতে হবে, হাতে আঁকা আদৌ উচিত নয় কারণ হাতে আঁকা সরলরেখা সরল রেখা হয় না এবং বৃত্তও ঠিক গোল হয় না। কিন্তু সমান্তরাল রেখা, লম্বরেখা, রেখাংশের মধ্যবিন্দু ইত্যাদির জন্য সম্পাদ্যের কঠোর নিয়ম অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। তা বলে, সমান্তরাল রেখা অদূরেই প্রতি চ্ছেদী, লম্বরেখা শোয়ান, মধ্যবিন্দু প্রান্তে এবং স্পর্শক বৃত্তের ছেদক, এসব হওয়া একেবারেই চলবে না। এ ধরনের চিত্র খাতায় থাকলে পরীক্ষক সহজেই বুঝে নেবেন যে পরীক্ষার্থী বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে বাস করছে। কম্পাস দিয়ে বৃত্ত আঁকার পরও যদি পরীক্ষার্থী বৃত্তের কেন্দ্রটি যথাস্থানে নিতে

না পারে, তাহলে এই ত্রুটির মাশুল তাকেই দিতে হবে। কেন্দ্র যথাস্থানে না হলে ব্যাসার্ধ; ব্যাস ইত্যাদি সবইত বেঠিক হবে। স্মরণ রাখা দরকার যে প্রশ্নে চতুর্ভুজ উল্লেখ থাকলে সামন্তরিক বা আয়তক্ষেত আঁকা উচিত নয়, সামন্তরিক উল্লেখ থাকলে আয়তক্ষেত্র আঁকা উচিত নয়, ত্রিভুজ উল্লেখ থাকলে ত্রিভুজটি সমবাহু বা সমদ্বিবাহু আঁকা উচিত নয়, বৃত্তের দুটি সমান জ্যার ক্ষেত্রে জ্যাদুটি সমান্তরাল আঁকা উচিত নয় এবং চিত্র মধ্যস্থিত কোনো বিন্দু সুবিধামত স্থানে নেওয়া চলবে না—এই সব ভুলের জন্য পরীক্ষার্থী প্রাপ্য নম্বর থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে।

বলা বাহুল্য, জ্যামিতিক চিত্রাদি কালি দিয়ে আঁকা উচিত নয়, পরন্তু ভাল মিডিয়াম সফ্‌ট ও সূক্ষ্মাগ্র পেনসিল ব্যবহার করা উচিত। চিত্রটি যাতে সুদৃশ্য হয় তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, কারণ অপরিচ্ছন্ন চিত্রের জন্য নম্বর কাটা যায়। প্রয়োজনবোধে জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কনের জন্য কার্ডবোর্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

উত্তর লেখার সময় চিত্রটি খাতার বাঁদিকের পৃষ্ঠার ওপর দিকে আঁকতে হবে এবং সমগ্র উত্তরটি যাতে ডান দিকের পৃষ্ঠার মধ্যে সমাপ্ত হয় তা চেষ্টা করতে হবে। এতে পরীক্ষক এবং পরীক্ষার্থী উভয়েরই চিত্রটি বারবার দেখার পক্ষে খুব সুবিধা হবে এবং অবাঞ্ছিত ত্রুটি থেকে উত্তরটি মুক্ত হবে।

বিশেষ নির্বাচনে ভুল—একটু বুঝে লিখলে এই অংশে কোন ভুল হওয়ার কথা নয়। প্রমাণিতব্য বিষয়টি প্রশ্নের বয়ান এবং অঙ্কিত চিত্র থেকে লেখা কি খুব কষ্ট সাধ্য? দুঃখের বিষয় যে এই অংশের বিবৃতির সঙ্গে চিত্র, অঙ্কন এবং পরবর্তী প্রমাণের মধ্যে প্রচুর অসঙ্গতি পরীক্ষার্থীর খাতায় থাকে। প্রশ্নে আছে, 'ত্রিভুজের বাহুগুলির সমদ্বিখণ্ডকত্রয় সমবিন্দু--প্রমাণ কর, পরীক্ষার্থীকে লিখে—প্রমাণ করতে হবে যে ∠A, ∠B, ∠C কোণগুলির সমদ্বিখণ্ডকত্রয় সমবিন্দু; পরবর্তী প্রমাণ পর্বে হয়ত প্রমাণ করে ত্রিভুজের লম্বসমদ্বিখকত্রয় সমবিন্দু। অঙ্কিত চিত্রের চিত্রের ব্যাখ্যা প্রায়ই এই অংশে ভুল বা অসম্পূর্ণ থাকে। পরীক্ষার্থী লিখে, 'D বিন্দু BC বাহুর উপর একটি বিন্দু, কিন্তু আসলে D বিন্দু BC বাহুর মধ্য বিন্দু; তারা লেখে, 'প্রমাণ করিতে হইবে যে D, E, F বিন্দুত্রয় সমবিন্দু', লেখা উচিত D, E, F বিন্দুতে বাহুগুলির ওপর অঙ্কিত লম্বত্রয় সমবিন্দু ইত্যাদি। এসব দেখে মনে হয় যে যুক্তিশীল মনন গঠনে পরীক্ষার্থীর জ্যামিতি পাঠ একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। এর একমাত্র প্রতিকারের উপায়,বাড়ীতে বসে উপপাদ্যগুলির প্রমাণ বই না দেখে লেখা এবং পরে সেগুলি বইয়ের সংগে মিলিয়ে নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করা।

অঙ্কনে ভুল—উপপাদ্যের প্রমাণের জন্য চিত্রে অনেক সময় বাড়তি কিছু অঙ্কনের প্রয়োজন পড়ে। এই অঙ্কনের বিষয়গুলি সমগ্র উত্তরের এই অংশে স্পষ্ট করে লেখার কথা। চিত্রে ঠিক মত অঙ্কিত থাকলে, এই পর্বে সেটির উল্লেখ না থাকার ত্রুটি মার্জনীয়; কিন্তু অঙ্কনের সংগে এই অংশের বিবৃতির মধ্যে কোনো বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হলে পরীক্ষক বেশ কিছু নম্বর কেটে নেন।

প্রমাণে ভুল—উত্তরের এই অংশটি সমগ্র উত্তরের প্রকৃত অংশ। পরপর যুক্তি দিয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে প্রমাণিতব্য বিষয়টিতে উপনীত হতে না পারলে কোনো নম্বরই পরীক্ষার্থীর ভাগ্যে জোটে না। যে উপাদানগুলির সাহায্যে প্রয়োজনীয় ধাপগুলি পাওয়া যায় সেগুলি ঠিকমত প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা তা স্পষ্টভাবে দেখাতে হবে। যেমন, দুটি ত্রিভুজ সর্বসম বললেই হবে না, কেন সর্বসম তার প্রয়োজনীয় এবং যথেষ্ট কারণগুলি উল্লেখ করতে হবে এবং এই কারণগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তি দিতে হবে। ত্রিভুজের সর্বসমতার ওপর যে কটি উপপাদ্য আছে সেগুলি ভালমত

ঐচ্ছিক গণিত বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রকাশিত সব আগামী সংখ্যায়।

জেনে রাখা দরকার। দুটি সমকোণী ত্রিভুজের সর্বসমতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাহুর পাশে 'অতিভুজ' কথাটির উল্লেখ অত্যাবশ্যক। সে রকম, অন্তর্ভূত কোণ, অনুরূপ বাহু ইত্যাদি কথাগুলি ক্ষেত্র বিশেষে উল্লেখ করার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। উদাহরণ দিয়ে নিবন্ধটি বিস্তৃত করার প্রয়োজন নেই কারণ পরীক্ষার্থী যে কোনো ভাল পাঠ্য পুস্তকের উপপাদ্যগুলির প্রমাণ অংশ দেখলেই বক্তব্যের সার্থকতা উল্লেখ করতে পারবে। এই সূত্রে বলা দরকার যে দুটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান বোঝাতে ক্ষেত্র $\triangle ABC =$ ক্ষেত্র $\triangle DEF$লেখা উচিত। প্রমাণের সময় কোনো বাড়তি শর্ত গ্রহণ করলে কোনো নম্বরই পরীক্ষার্থী পায় না। দুঃখের বিষয়, যেটি প্রমাণ করতে হবে সেটিও প্রদত্ত বিষয় হিসেবে পরীক্ষার্থীরা প্রায়শঃই প্রমাণে উল্লেখ করে থাকে। পীথাগোরাস উপপাদ্যটির প্রয়োগবিধি সম্পর্কে পরীক্ষার্থীর সতর্ক হওয়া উচিত।

উপপাদ্য প্রমাণের সময় দুটি বিশেষ প্রতীকের ব্যবহার হয়ে থাকে, একটি 'অতএব' চিহ্ন $\therefore$ এবং অপরটি 'যেহেতু' চিহ্ন $\because$। দেখা যায় এই দুটি চিহ্ন ব্যবহারে ছাত্র/ছাত্রীরা দারুণভাবে দুর্বল। এই দুর্বলতা দূর করতে না পারলে গণিতে কখনই ভাল নম্বর পাওয়া যায় না। এছাড়া আরও আরও কিছু প্রতিকের অপব্যবহার পরীক্ষার্থীরা খাতায় করে থাকে যেমন কোণ বোঝাতে কোণ চিহ্ন (∠বা ∠) দেয় না, সমান্তরাল চিহ্ন ॥ -কে সমান চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা ইত্যাদি।

(শেষাংশ 54 পৃষ্ঠায়)

ক্রিস্টোফার কলম্বাস যে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন সে খবরটা তোমাদের প্রায় সকলেরই জানা। কিন্তু অনেকেরই বোধহয় জানা নেই যে ইউরোপবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম রাবারের বল তৈরি হতে দেখেছিলেন। সময়টা ছিল 1493 সাল। কলম্বাস তাঁর আবিষ্কৃত নতুন পৃথিবীর উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার অভিযান চালাচ্ছিলেন। তাঁর জাহাজ যখন ক্যারিবিয়ান সাগরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তিনি হাইতি দ্বীপে একদল ছেলেকে একটা অদ্ভুত ধরনের বল নিয়ে লোফালুফি খেলতে দেখলেন। ছেলেরা মাটিতে জোরে ছুঁড়ে দেবার পর বলটা আবার অনেক উঁচুতে লাফিয়ে উঠছিল। তিনি লক্ষ্য করলেন, চেপে ধরলে বলটা আকারে ছোট হয়ে যাচ্ছে, আবার ছেড়ে দিলে তা আগের আকার ফিরে যাচ্ছে। এ ধরনের বস্তু কলম্বাস আগে কখনো দেখেন নি। তিনি জাহাজ থামিয়ে দেখতে গেলেন ব্যাপারটা কি? তিনি দেখতে পেলেন, দ্বীপের আদিবাসীরা কতকগুলো অচেনা গাছের ছালের মধ্যে গর্ত করে হাঁড়ির মত পাত্র বেঁধে রেখেছে, আর ঐ সব গর্ত থেকে দুধের মত তরল পদার্থ ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে হাঁড়িতে পড়ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ তরল পদার্থ জমে শক্ত ও কাল হয়ে যাচ্ছে। এই জমে যাওয়া জিনিস থেকেই বল তৈরি করা হচ্ছে।—কলম্বাস আশ্চর্য হয়ে গেলেন বলটির স্থিতিস্থাপকতা গুণ লক্ষ্য করে।—**কলম্বাসকেই ধরে নেওয়া হয় প্রথম ইউরোপবাসী যিনি রাবারের বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছিলেন।**

প্রত্নতাত্ত্বিকদের সমীক্ষা অনুযায়ী 11-র শতকে মধ্য আমেরিকার হণ্ডুরাসের অধিবাসীদের একইভাবে রাবারের তাল নিয়ে খেলতে দেখা গেছে। প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি বছর আগেকার রাবারের ফসিল বা জীবাশ্মও খুঁজে পাওয়া গেছে।—কিন্তু রাবার নামটি এসেছে কলম্বাসের রাবারের বল দেখার আরও প্রায় 300 বছর পরে। 1770 সালে প্রখ্যাত ইংরাজ রসায়ননবিদ জোসেফ প্রিস্টলী দেখেন যে সাদাটে নমনীয় একরকমের কঠিন বস্তু দিয়ে ঘষলে কাগজের ওপরে লেখা লেড পেনিসলের দাগ সহজেই উঠে যাচ্ছে। ঘষে রাবার করে দাগ ওঠান গেল বলে তিনি জিনিসটির নাম দেন রাবার। প্রাকৃতিক রাবার পাওয়া যায় রাবার গাছ থেকে, যার নাম উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা রেখেছেন হিভিয়া ব্রাসিলিএন্‌সিস্‌। এই গাছ 100 বছর পর্যন্ত বাঁচে আর 80 ফিটের মত লম্বা হতে পারে। গাছটির আদিবাস ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিলের আমাজন অঞ্চলে। সেখান থেকে চারা এনে পরে মালয়, ইন্দোনোশিয়া, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোচীন বর্মা, বোর্ণিও প্রভৃতি জায়গায় রাবার গাছ লাগান হয়। সাধারণত 6 থেকে 40 বছর বয়সের রাবার গাছের ওপরের দিকের ছাল চিরে দিলে সাদা দুধের মত আঠাল বস্তু ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে যার নাম ল্যাটেক্স। এই ল্যাটেক্স কিন্তু উষ্ণপ্রধান দেশের কিছু কিছু উদ্ভিদের দেহ থেকে নির্গত স্যাপ বা রসের থেকে আলাদা। ল্যাটেক্সের মধ্যে শতকরা 35 ভাগ থাকে রাবারের ছোট ছোট কণা বাকীটা থাকে জলীয় অংশ। তরল ল্যাটেক্সে অ্যাসিটিক বা ফরমিক অ্যাসিড দিলে যে সাদা জমাট জিনিসটি পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় ঘনীভূত ল্যাটেক্স বা রাবার। 1826 সালে ইংরাজ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে প্রমাণ করে দেখান রাবার হাইড্রোজেন ও কার্বনে তৈরি হাইড্রোকার্বন যৌগ। 1860 সালে প্রমাণিত হয় রাবারের মূল অণু হল পাঁচটি কার্বন ও আটটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে তৈরি আইসোপ্রিন অণু, যার রাসায়নিক সঙ্কেত C_5H_8। প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, টারপেনটাইনের মধ্যে 370 থেকে 2600টি পর্য্যন্ত এইরকম আইসোপ্রিন অণু, লম্বা শেকলের মত পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লেগে থাকে। রাবারকে তাই বলা হয় বৃহৎ অণু পলিমার, যার আণবিক ওজন 25,000 থেকে 180,000 এর মত। প্রাকৃতিক রাবার খুব নমনীয় হওয়ায় সহজেই ঘর্ষণে ক্ষয় পায়, বেশি তাপে সহজে গলে চটচটে হয়ে যায়, আবার কম তাপে শক্ত ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। এই রাবার তাই আমাদের বড় একটা কাজে লাগে না। 1839 সালে আমেরিকার চার্লস গুডইয়ার, তাপ ও চাপের সাহায্যে প্রাকৃতিক রাবার ও গন্ধকের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটালেন, যাকে বলা হয় ভলকানাইজেসান্‌। এর ফলে রাবারের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা ও দৃঢ়সংবদ্ধতা বাড়ল এবং নমনীয়তা কিছুটা

কমল। এই রাবারই আমাদের নানান কাজে লাগে। 1841 সালে গুডইয়ার প্রথম রাবারের জিনিস তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। 1876 সালের মধ্যেই সেখানে গাড়ীর টায়ার টিউব বর্ষাতি প্রভৃতি তৈরি হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে অন্য সব দেশেও এইরকম রাবারের কারখানা স্থাপিত হয়।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও বেড়ে চলে, প্রাকৃতিক রাবার সেই প্রয়োজন মিটিয়ে উঠতে পারে না। সবদেশের মাটি ও আবহাওয়া আবার রাবার গাছ চাষের উপযোগীও নয়। প্রাকৃতিক রাবার একদিকে যেমন খুব বেশি বা খুব কম তাপ সহ্য করতে পারে না, অন্যদিকে আবার রাসায়নিক পদার্থ, বিভিন্ন দ্রাবক ইত্যাদির দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। এই সব কারণে বিজ্ঞানীদের কৃত্রিম রাবারের কথা ভাবতে হল। এর ওপর 1914 সালে আরম্ভ হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানী, ইউরোপের আর সব দেশও আমেরিকার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। প্রাকৃতির রাবারের অভাবে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে জার্মানীই প্রথম কৃত্রিম রাবার তৈরি করল, যার মূল অণু আইসোপ্রিন নয়, ডাইমিথাইল-ডাই-ইন্। এই রাবারের নাম দেওয়া হল S. B. R. রাবার অর্থাৎ স্টাইরিন্-বিউটাডাই-ইন্ রাবার। এই S. B. R. রাবারকে বলা হয় ফার্স্ট জেনারেসান্ অর্থাৎ প্রথম প্রজন্মের কৃত্রিম রাবার। গুণ-গতমান ভাল না হওয়ায় এই রাবার বড় একটা ব্যবহার করা হয়নি। 1925 সাল থেকে দ্বিতীয় প্রজন্মের রাবার তৈরির চেষ্টা আরম্ভ হল। এবার বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষ ধর্মসম্পন্ন রাবার তৈরির চেষ্টা চলল। যেমন, অ্যাসিটিলিন ও ক্লোরিনের যৌগ নিওপ্রিন অণুর সংযোগে তৈরি হল নিওপ্রিন রাবার। তুলনায় এই রাবার দামী হলেও, তেল ও সূর্য্যালোক থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা এর খুব বেশি। তাই তৈলবাহী নল, পেট্রোলের আধার প্রভৃতি তৈরির কাজে এই রাবার ব্যবহার করা হয়। 1930 সালে প্রথম কৃত্রিম রাবার বাজারে ছাড়া হয়। এর পর তৈরি হতে থাকে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব অণুর সংযোগে একের পর এক বিশিষ্ট ধর্মসম্পন্ন কৃত্রিম রাবার। তৈরি হল থায়োকল্ রাবার এক বিভিন্ন দ্রাবক দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না, নাইট্রাইল্ রাবার, যা উচ্চতাপ সহনক্ষম এবং বিউটাইল্ রাবার, যার বাতাস পরিব্যাপ্ত করার ক্ষমতা খুব বেশি ইত্যাদি। 1956 সালে বিজ্ঞানী জিগ্লার ও নাটা তৃতীয় প্রজন্মের কৃত্রিম রাবার তৈরি করেন সিস্ 1-4 পলি-আইসোপ্রিন থেকে। এই রাবারের গুণাগুণ প্রায় প্রাকৃতিক রাবারের মত। ভলকানাইজ করার প্রয়োজন না হওয়ায় এই রাবার তৈরির খরচও পড়ে কম। 1970 সালে তৈরি হয় চতুর্থ প্রজন্মের কৃত্রিম রাবার, যার নাম S.B.S. রাবার বা আরমোপ্লাষ্টিক ইলাসটোমার। এই রাবারে, রাবার ও

অভিনেতার মুখ রবারে সাজানো হচ্ছে

প্লাস্টিক উভয়ের ধর্মই বজায় থাকে। প্রাকৃতিক রাবারকে একবার গলালে তা আর ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু এই রাবার তাপ দিয়ে গলিয়ে নিয়ে প্লাষ্টিকের মত আবার ব্যবহার করা যায় এবং ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন হওয়ার পর এর মধ্যে রাবারের স্বাভাবিক নমনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকতা-গুণ আবার ফিরে আসে।

একটা ব্যাপার মনে রাখা প্রয়োজন যে কৃত্রিম রাবার কিন্তু কৃত্রিমভাবে তৈরি প্রাকৃতিক রাবার নয়। কৃত্রিম রাবারে প্রাকৃতিক রাবারের গুণগুলিকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখতে এবং দোষগুলিকে যথা সম্ভব দূর করতে চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট কৃত্রিম রাবার মিশিয়ে একই জিনিসের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্ম বজায় রাখা হচ্ছে। যেমন, মোটরগাড়ি, লরি প্রভৃতির টায়ারের বাইরের অংশ, খুব শক্ত সহজে ঘর্ষণে ক্ষয় পায় না এমন রাবারে তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ভিতরের অংশ যার মধ্যে নমনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকতাগুণের প্রয়োজন, তা অন্য ধরনের রাবারে তৈরি হচ্ছে। এর ফলে এখন টায়ার টিউব প্রভৃতি অনেক উচ্চমানের ও দীর্ঘজীবনসম্পন্ন হচ্ছে।

একটা সময় ছিল যখন রাবার ব্যবহার করা হত কেবল-মাত্র গাড়ির টায়ার টিউব প্রভৃতি তৈরি করতে। বর্তমানে পৃথিবীতে ব্যবহৃত রাবারের শতকরা প্রায় 50 ভাগ টায়ার টিউব প্রভৃতি তৈরির কাজে লাগে। বাকীটা লাগে অন্যান্য কাজে। রাবার যে কতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। রাবারের হোস্পাইপ, বেল্ট, ব্যাগ প্রভৃতি আগেই ব্যবহার করা হত। এখন হাতঘড়ির জন্য রাবারের ব্যাণ্ড তৈরি হচ্ছে যা নরম চামড়ার মত নমনীয় অথচ স্টীলের মত দৃঢ়। আধুনিক ফ্যাশানের চিবুনি টুপি

বুট জুতো, ছাতার বাঁট, হাঁটার লাঠি এমনকি মেয়েদের হার, দুল, বালা প্রভৃতি রাবারের কৃত্রিম অলঙ্কারেরও এখন খুব চলন হয়েছে। সেতু, বাঁধ প্রভৃতিতে ফাটলের আশঙ্কা রাবারের জলনিরোধক আস্তরণ দেওয়া হচ্ছে। রাবার বিদ্যুৎ অপরিবাহী। রাবারের আস্তরণ দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ ও কম্পনরোধ করা যায়। 1984 সালে দুটি আণবিক চুল্লী বিশেষ ধরনের রাবারের বেয়ারিং-এর ওপর বসান হয়েছে। শল্যচিকিৎসায়, কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরিতে, বিকৃতাঙ্গদের অঙ্গ সঠিক আকারে আনার কাজেও এখন রাবার ব্যবহার করা হচ্ছে। বছর দুই আগে ফ্লোরিডাতে একটি 160 কিলোগ্রাম ওজনের কচ্ছপের সামনের দুটি পা হাঙরে কেটে নিয়েছিল। রাবারের দুটি কৃত্রিম পা লাগিয়ে কচ্ছপটি এখন অনায়াসে সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে। মানুষের ক্ষেত্রেও এইরকমের কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাগাবার চেষ্টা চলছে। তাছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে অস্থির সংযোগস্থলে নমনীয় বিশেষ ধরনের রাবার লাগান হচ্ছে যা পেশীর মত স্থিতি-স্থাপকতাগুণসম্পন্ন। মহাকাশচারীদের পোশাকে, খেলার সরঞ্জামে, ডুবুরীদের পোশাক ও জলে ডোবার বিভিন্ন সরঞ্জামে এখন বিশেষ ধরনের রাবার ব্যবহার করা হচ্ছে। জলে ডুব দেবার সময় ডুবুরীরা যে মুখোস ও একোয়ালাঙস বা কৃত্রিম ফুসফুস ব্যবহার করেন তাও রাবার দিয়ে তৈরি হচ্ছে। অলিম্পিক সাঁতারুরা রাবারের একরকম বিশেষ ধরনের মোজা ব্যবহার করছেন, যার ফলে পা-এর বিশেষ ধরনের সংক্রামক চর্মরোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। সিনেমায় বিশেষ ধরনের প্রসাধনের সময়ে চোখ, কান, চিবুক প্রভৃতিতে পরিবর্তন আনার জন্য, বলীরেখা বা মুখের অন্যান্য খুঁত ঢাকা দেবার জন্য, এমনকি পুলিসের গোয়েন্দাদপ্তরে ছদ্মবেশ ধারণের জন্য এখন রাবার খুব বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। বলতে গেলে আমাদের বর্তমান সভ্যতা রাবারের ওপর প্রায় সবদিক দিয়েই নির্ভরশীল। আর এই ব্যবহার করা রাবারের শতকরা অন্ততঃ 50 ভাগই কৃত্রিমভাবে তৈরি।

জ্ঞানবিজ্ঞানের বই

কিশোর রহস্য উপন্যাস সমগ্র ৩৫·০০
ডাঃ বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচি
"মোম প্রকাশনী", 14/2 বিজয়গড় রোড, কলকাতা-32

আইনস্টাইন ৪৫·০০
সম্পাদক ঃ তপন চক্রবর্তী ও শাহ্‌জাহান তপন
স্টুডেণ্ট ওয়েজ", 9 বাংলা বাজার, ঢাকা-1, বাংলাদেশ

ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশু সাহিত্যিক। তাঁর নাম সুপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থে ডাঃ বাগচীর তিনখানি কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী উপন্যাস স্থান পেয়েছে। সেই উপন্যাস তিনটি হলো যথাক্রমে 'মহাশূন্যের ডায়েরী', 'বিজ্ঞানী ও শয়তান' এবং 'ট্যারেণ্টুলার হুল'। তিনটি উপন্যাসই বিজ্ঞানভিত্তিক এবং চিত্তাকর্ষক। তবে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে 'মহাশূন্যের ডায়েরী" শীর্ষক উপন্যাসটি। অপর উপন্যাস দু'টি চলনসই। ডাঃ বাগচী দীর্ঘকাল ধরেই বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প কাহিনী লিখে চলেছেন, পরিণতবয়স্ক একজন চিকিৎসক, অবসর সময়ে যে সাহিত্য সাধনা করে চলেছেন এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে যে যে তিনটি বিজ্ঞানভিত্তিক কিশোর রহস্য উপন্যাস এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে তা প্রশংসার দাবী রাখে। যথারীতি অন্যান্য বাংলা গ্রন্থের মত এই গ্রন্থটিও মুদ্রণ প্রমাদ মুক্ত নয়। তবুও বলব যে, বিজ্ঞানপ্রেমী কিশোর কিশোরীদের কাছে এই গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে।

অন্য গ্রন্থটি ওপার বাংলা অর্থাৎ 'বাংলাদেশ' থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত। প্রকৃত অর্থেই যা প্রশংসার দাবী রাখে। বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নাম জানা নেই এমন লোক দুর্লভ। আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার তত্ত্ব সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সহজ সাধ্য নয়। একাধিক লেখক আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। যথা অজয় রায় আলোচনা করেছেন আধুনিক কোয়াণ্টাম তত্ত্ব ও আইন-স্টাইনের দর্শন চিন্তা সম্পর্কে, আবদুল্লাহ আল-মুতী আলোচনা করেছেন আইনস্টাইনের জগৎ সম্পর্কে. "শতবর্ষের আলোকে আইনস্টাইন"—এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন শাহজাহান তপন।—এমনি আরও কিছু আলোচনার মাধ্যমে আইনস্টাইনের বিজ্ঞান ভাবনা অতি সুন্দরভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আলোচ্য গ্রন্থে। আইনস্টাইন মানুষ ও বিজ্ঞানীরূপে কেমন ছিলেন তা এককভাবে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু সম্পাদকদ্বয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টার মানুষ আইনস্টাইন ও বিজ্ঞানী আইনস্টাইন—এই দুইয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে এই গ্রন্থে এবং তার সাথে বিজ্ঞান জিজ্ঞাসু সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানী ও মানুষ আইনস্টাইনের একটা সামগ্রিক পরিচয় পেয়ে থাকবেন এই গ্রন্থ পাঠে। একাধিক লেখক এই গ্রন্থ রচনায় অংশগ্রহণ করায় এবং সম্পাদকদ্বয়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় এই গ্রন্থখানি মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এক সামগ্রিক পরিচয় উদঘাটনে সক্ষম হয়েছে। আশা করি এপার ওপার উভয় বাংলায় এই গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে।

—অমরনাথ রায়

টেলিপ্যাথির এই গল্পটা জনৈক প্রকাশ পাণ্ডে বলেছিলেন বিজয় শর্মাকে, বিজয় শর্মা বললেন আমাকে।

সামসিং রেঞ্জের ফরেস্ট-বাংলোর লনের সবুজ ঘাসের ওপর দুটো বেতের চেয়ারে মুখোমুখি বসে গল্প করছিলাম দুজনে। মিস্টার শর্মার সঙ্গে আগে আমার পরিচয় ছিল না। কর্মক্ষেত্রও দুজনের ভিন্নমুখী। আমি ভূমি-রাজস্ব বিভাগে আছি, উনি আয়কর বিভাগের পদস্থ অফিসার। এখানে এসে আমাদের পরিচয় হয়। দুজনেই কাজকে ছুটি দিয়ে পাহাড়ের ওপরে এই প্রাকৃতিক শান্তিনিকেতনে দুটো দিন বেড়িয়ে যেতে এসেছিলাম। অবশ্য একটা জায়গায় দুজনের মিল ছিল। আমরা দুজনেই কালিম্পঙের ফরেস্ট কর্পোরেশনের ডি-এম সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আলাপ হবার পর দেখা গেল দুজনের পছন্দ আর ভাল লাগাটাও একই রকমের। এক্ষেত্রে যা হওয়া উচিত, তা-ই হল। বন্ধুত্ব হতে সময় লাগল না।

আমরা যখন গল্প করছিলাম তখন বিকেলের সূর্য অনেকক্ষণ আগে নেমে গেছে পেছনের পাহাড়ের আড়ালে। ঝুপ করে নেমে এসেছে নির্জন সন্ধ্যে। আমাদের সামনে চারদিকে ঘুম-ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে আছে ছায়াছন্ন পাহাড়, গা বেয়ে নেমে আসা অন্ধকার অরণ্য, নিস্তব্ধ চা-বাগান আমাদের মাথার ওপরে স্থির হয়ে আছে নিভে-যাওয়া আকাশ। আকাশের গায়ে তখন সদ্যজাত দু-একটা তারা।

আমাদের গল্পের কোনো নির্দিষ্ট বিষয় ছিল না। যখন যা এসে যাচ্ছিল, তাই নিয়েই গল্প করছিলাম। এক সময় মিস্টার শর্মা বললেন, 'বুঝলেন, আমার খুব ইচ্ছে ছিল

(শেষাংশ 47 পৃষ্ঠায়)

খুদে বৈজ্ঞানিক

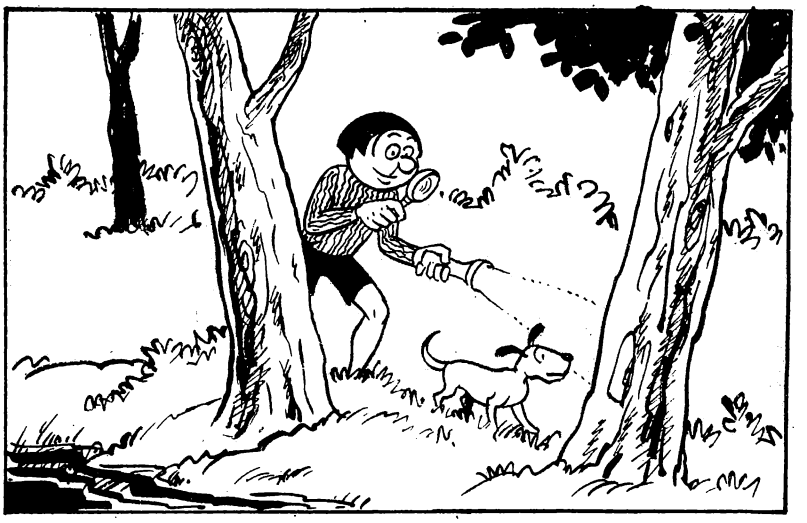

দিলীপ দাস

যাঃ ব্বাবা! কি এমন সোনাদানা পেল যে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না?

দাঁড়াও, আর চিন্তার কোন কারণ নেই জিনিস পত্র নিয়ে আসি—সব গন্ডগোল উৎপাটন করবো।

পেয়েছি!

আ-মলো যা, তুই আবার কি পেলি?

তুই যে ঐ সোনাদানার কথা বললি না? তার থেকেই আমি আইডিয়া করে নিলুম—খুদে নির্ঘাৎ কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে।

অ্যাঁ, ব-বলিস কিরে পুটি গু-গু-গুপস্!

চুপ্। চেল্লাস্‌নি হাঁদারাম! ও চলে গেছে, এই ফাঁকে সব আমরাই বের করে নেব।

ওতো এখানটাতেই খুঁজছিল! তাড়াতাড়ি হাত চালা, ও এসে দেখবে সব চিচিং ফাঁক। হিঃ-হিঃ-হিঃ।

চারাবাগানে গুপ্তধন, যতোসব আজগুবি চিন্তা তোর!

তুই কিচ্ছু জানিস না। শোন, গুপ্তধনের কোন স্থান কাল পাত্র নেই। আগেকার দিনে রাজা মহারাজা দস্যু ডাকাতদের লুকিয়ে রাখা ধন-সম্পদই কালে গুপ্তধনে পরিণত হয় এবং যে তা খুঁজে বের করতে পারে তারই লাক্ বলতে হবে।

তা বলে চারা-বাগানের এই এঁদো জলার ধারে? ধ্যুস্।

অ্যাই, বৃষ্টি এলো নাকি? থেমে গেছে।

তাই তো রে! বৃষ্টির জলটা কি বিচ্ছিরি গন্ধ, ইস্! ঐ আবার এলো।

এ তো বৃষ্টি নয়!
তবে— কে বে গায়ে জল দিচ্ছিস?
আরে, তোরা এখানে কে রে?

আ-আমরা, আ-আমি চুনো—!
আ-আমি আঃ, তোর শাওয়ারটা আগে বন্ধ করনা! এ্যাঃ, কি দুর্গন্ধ!

গরি। চুনো পুঁটি তা তোর এখানে কি করছিস?

কেঁচো ধরবো বলে মাছ খুঁজছিলুম!
ইডিয়েট! কেঁচো খুঁজছিলুম মাছ ধরবো বলে।
?
MARCH·87

এত রাত্রে এই জঙ্গলে? সঙ্গে একটা টর্চও আনিসনি, এখানে কত সাপখোপ থাকতে পারে, ভয় নেই তোদের?

তা, তুই এখানে কি করতে এসেছিস, খুদে?
আমি? আমি বিড়লেক্স খুঁজতে এসেছি।

কিউলেক্স, সেটা আবার কি? কোন গুপ—উপস্!
বলছিলুম, ওটা কি খুব গোপনীয় কিছু?
গোপনীয় মানে, মানুষের এক নম্বর গুপ্ত শত্রু বলতে পারিস।
ম্যালেরিয়ার বাহক এই মশা। আর এক জাতের মশা আছে—এ্যানোফিলিস্। জলা জঙ্গলেই এদের আস্তানা। স্যার রোনাল্ড রস প্রথম এদের আবিস্কার করেন
ওম্মা, আমি ভাবলুম খুদে জীব জন্তু শিকার করতে বেড়িয়েছে! শেষকালে মশা মারতে!
মশা মারতে এত সরঞ্জাম লাগে? হাতের একটা চড়ই তো যথেষ্ট! এর জন্যে জঙ্গলে আসতে হয়, ঘরেই তো কত পনপন করছে—সব বুদ্ধির ঢেঁকি!
শুধু ম্যালেরিয়া নয়। ডেঙ্গু ফাইলেরিয়া এনসি-ফালাইটিস্ ইত্যাদি রোগও এই মশার কামড় থেকেই হয়। সুতরাং আগে থেকে সাবধান হওয়াটাই কি ভাল নয়?
ও ব্বাবা, এযে দেখছি বাঘেরও বাড়া!
দেখলুম মশার আতংক এখানে। তাই এই ওষুধটা স্প্রে করে মশার বংশ ধ্বংস করবো।
মশা। আমরা মনে করেছিলুম তুই গু—গুপস্!
চোপ্, রাস্কেল! ঠিক আছে, তুই ওষুধটা ভাল করে স্প্রে করে দিস। খুদে।
উজবুক কাঁহেকা! আর একটু হলেই তুই প্রেস্টিজ পাংচার করে দিচ্ছিলি! ও এসেছে মশা মারতে আর আমরা—
ওর উদ্দেশ্য খুবই মহৎ। তবে কিনা বজ্জাতটার ঐ রকম অন্ধকারে উঁকি-ঝুকি মারা চোর চোর ভাব—সব মিলেই তো একটা বিশ্রী ধরণা করে ঘোল খেয়ে গেলুম!

রেমব্রান্টঃ কিম্বারসক্যুরো

অহিভূষণ মালিক

পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন—ইংরাজীতে Physics এবং Chemistry—শিল্পীরা এ দুই বিজ্ঞান বিষয়ে মাথা ঘামান দরকার বোধ করেন না। কিন্তু বিজ্ঞানের কথা ভেবেই হোক আর না ভেবেই হোক মহা মহা শিল্পী এমন বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ফেলেছেন যা বৈজ্ঞানিকদের শুধু কাজেই লাগেনি, রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হাওয়ায় ভেসে যেতে চায়; কিন্তু কেমনভাবে তা সম্ভব হবে, কেমনই বা হবে সেই-যানটির আকৃতি, কল্পনায় দেখেছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। হাওয়াই যানের প্রথম ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছিলেন লিওনার্দো তা তোমরা সবাই জানো। কিন্তু, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির পরিচয়, বৈজ্ঞানিক বা ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে নয়, এক মহাচিত্রকর হিসেবে। লিওনার্দোরই আঁকা জগৎবিখ্যাত ছবি মোনালিসা। প্যারী শহরের লুভ্‌র আর্ট মিউজিয়ামের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সংগ্রহ ঐ মোনালিসা। লিওনার্দো বা মোনালিসার বিষয়ে বলব বলে আজ গল্প ফেঁদে বসিনি, বসেছি আরেক মহাশিল্পী রেমব্রান্টের কাহিনী এবং তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা শোনাতে, কথা প্রসঙ্গে লিওনার্দোর নাম এসে গেল।

জাতে ওলন্দাজ, রেমব্রান্টের জীবন আদৌ সুখের ছিল না। যদিও তিনি গরীবের ঘরে জন্ম নেন নি। কিন্তু কতবড়, শুধু শিল্পীই নন, বৈজ্ঞানিক ছিলেন রেমব্রান্ট। রেমব্রান্ট এ পৃথিবীর আলো দেখেন প্রথম 15 জুলাই 1607 সালে। অর্থাৎ আমি তোমাদের 17 শতকের কাহিনী বলছি। 17 শতকের এ মহা শিল্পীর আঁকা ছবি ইউরোপের সব বড় বড় আর্ট মিউজিয়াম এবং গ্যালারি, যেমন মিউনিখের আল্টে পিনাকুটিক, বার্লিনের ডালেম, পারীর লুভ্‌র, হামবুর্গের কুন্সঠাল, মাদরিদের প্রাদো, ইংলণ্ডের টেট গ্যালারী, আমসটার ডামের রিকস মিউজিয়াম—কত নাম করব, তাদের সংগ্রহে জমা করে গর্ব বোধ করে। গর্ব করার মতই তো বিষয়! রেমব্রান্টের ছবির দাম একেকখানার কোটি টাকারও বেশী। শুনলে মনে কষ্ট পাবে রেমব্রান্টের শেষ জীবন কেটেছিল চরম দারিদ্র্যে। তিনি কি জানতেন তাঁরই ছবি পরবর্তীকালে বিক্রি হবে এমন মূল্যে যার এক দশাংশও জীবদ্দশায় পেলে তাঁর কয়েক পুরুষ কেটে যেত বড়লোকী চালে। শিল্পীর দারিদ্র্যের কারণটা কী ছিল জানো? খরিদ্দারদের মন না রেখে বড় বেশী স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর কাজে। ছবি আঁকার বিজ্ঞান নিয়ে বড় বেশী ভেবে ফেলেছিলেন। আরও একটা কারণ ছিল, যে সমাজের মানুষ রেমব্রান্ট সে সমাজের সঙ্গেও খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি নিজেকে। সমাজ তাঁকে ছেড়ে দেবে? একঘরে করে, ভাতে মেরে তাঁকে জব্দ করল তাঁরই সমাজ। রেমব্রান্টের কাছে সব মানুষ সমান সম্মানের, সমান গুরুত্বের, সমান আদরের অধিকারী। ইনি বড় জাতের, উনি ধনী, এ ছোটলোক, ও অশিক্ষিত এসব ভেদাভেদ তাঁর চোখে ছিল না। সে যুগের মানুষ হয়ে রেমব্রান্ট যে কেমন করে স্বার্থপর সমাজের এসব নীচতাগুলো উপেক্ষা করার সাহস পেয়েছিলেন, তা বলা কঠিন। এ সাহসের জন্যে তাঁকে খেসারত দিতে হয়েছে বটে কিন্তু আজ তাঁকে জগৎ-শ্রেষ্ঠদের সঙ্গে আসন দিয়েছি আমরা। মহা মহা বিশেষজ্ঞেরা রেমব্রান্টের চিত্রকলা যে কত উচ্চমানের, কত স্বকীয়, কত বিজ্ঞানভিত্তিক তা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতম এই রেমব্রান্ট।

ছোট্ট করে তাঁর জীবনীটা সেরে ফেলি, তোমাদের নিশ্চয় কৌতূহল হচ্ছে তা জানতে। অবস্থাপন্ন পিতার পুত্র রেমব্রান্ট স্কুলে ভর্তি হল লেখাপড়া শিখতে। পিতার ইচ্ছে মস্ত বিদ্বান হবে তাঁর পুত্র—অনেক পড়াশোনা করা বিদ্বান। কিন্তু পাঠ্য পুস্তকে দেখা গেল রেমব্রান্টের তেমন মন বসে না, কাগজ-পেন্সিল হাতে নিয়ে সে আপন মনে আঁকিবুকি কাটে, নানান বস্তুর ছবি আঁকে, নক্সা করে। অঙ্কের খাতা ভর্তি হয় অঙ্ক কষে নয়, জীবজন্তুর ড্রইং-এ। ক্লাসের পরীক্ষায় ফল ভাল হয় না। পিতা অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন পুত্রের যখন ছবি আঁকায় ঝোঁক তখন ছবিই আঁকুক সে। রেমব্রান্টের টিউটর ঠিক হল সে সময়ের এক নামকরা প্রতিকৃতি শিল্পী

K.G.B./Feb/87/7

পীটার লাস্টম্যান। কিন্তু ব্যস, ছমাস! আমস্টারডামের লাস্ট-ম্যানের স্টুডিও-তে ছমাস থাকার পর আর রেমব্রাণ্টকে দেখা গেল না। ছমাস ধরে রেমব্রাণ্ট যা শিখেছে লাস্টম্যানের কাছ থেকে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী শিখেছে সে ফ্লেমিশ, স্প্যানিয়ার্ড আর রনেসাঁস দিকপাল শিল্পীদের আঁকা কীর্তি নানা মিউজিয়ামে দেখে দেখে। রেমব্রাণ্টের মত প্রতিভাকে শেখাবার মত সাধ্য কোথায় লাস্টম্যানের? রেমব্রাণ্ট ফিরে এল লীডেনে, তাঁর পিত্রালয়ে। পিতা কিছুটা চটবেন তো নিশ্চয়ই, সে সময়কার অত নামকরা শিল্পী লাস্টম্যান, অত ধনী, পুত্রের পছন্দ হলনা তার শিক্ষাধীনে থাকা? কিন্তু রেমব্রাণ্টকে বোঝান গেল না, সে লাস্টম্যানের স্টুডিও-তে আর ফিরে যাবে না। কোন শিক্ষক দরকার নেই রেমব্রাণ্টের সে নিজে নিজে ছবি আঁকবে। চলল তার পরীক্ষা নিরীক্ষা। প্রতিকৃতি আঁকায় খুব হাত পেকেছে, বাড়িতে অতিথিরা এসে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, এ বলে আমার একটা ছবি এঁকে দাও, ও বলে আমার একটা এঁকে দাও। আবার, ছবি আঁকা শেখানর মাস্টারিও করতে লেগেছে সে। প্রতিকৃতি এঁকে সে এত নাম করে ফেলল, সে নাম পৌঁছল আমস্টারডামে। আমস্টারডাম থেকে ধনীরা আসেন লীডেনে রেমব্রাণ্টকে দিয়ে পোরট্রেট আঁকাতে। আমস্টারডামের ব্যবসায়ী মহলে তখন শুধু রেমব্রাণ্টের নাম, রেমব্রাণ্টকে নিয়ে কাড়াকাড়ি, অসাধারণ সাদৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম এই ছোকরা আর্টিস্ট! ব্যবসায়ী-দের ঘরের নারী পুরুষের ছবি এঁকে চলেছে রেমব্রাণ্ট একটার পর একটা, লীডেন থেকে চলে এসেছে আমস্টারডামে, মেজাজ দেখে কে তার তখন, অগ্রিম অর্থ না পেলে রেমব্রাণ্ট ছবি আঁকবে না। ইতিমধ্যে এচিং ক্রিয়াকৌশলেও হাত পাকিয়ে নিয়েছে। দেখতে দেখতে রেমব্রাণ্ট এক মস্ত ধনী শিল্পী। রেমব্রাণ্ট প্রতিকৃতি আঁকে অর্থোপার্জনের জন্যে। কিন্তু শুধু প্রতিকৃতি এঁকেই রেমব্রাণ্ট থেমে থাকার পাত্র নয়, সে এঁকে চলেছে নানা অন্য বিষয়বস্তুও। ধর্মীয় বিষয়ও বাদ নেই। পিটার পল রুবেনস্-এর তখন দেশ জোড়া নাম, দেশ জোড়া বললে তাঁকে ছোট করা হবে, মহাদেশ জোড়া। বারোক আর্টের প্রবর্তক তিনি। ইতালীর লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মিকেলাঞ্জেলো, রাফেল আর ভেনিসের তিতিজিয়ানোর রনেসাঁস্ চিত্রকলার পরবর্তী ধারা বলে ধরা হয় বারোক আর্ট। খুবই স্বাভাবিক, রেমব্রাণ্টের কাজে বারোক প্রভাব পড়বে। বারোক ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করি, রনেসাঁসের পূর্ববর্তী চিত্র-কলায় মানুষ গিয়েছিল হারিয়ে। ভগবান যীশুকে আঁকা হত কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক ভাবে. কারণ ঈশ্বর তো আর পৃথিবীর মানুষ নন, স্বর্গ তাঁর আবাস। মানুষের রূপে তাঁকে দেখালে ছোট করা হবে না? কিন্তু বাইবেলে আছে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান জীব হিসেবে মানুষকে তাঁর নিজ চেহারায়। এই কথাটাই যে মানুষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যে তা জোর দিয়ে বলতে পারব না, তবে জিওত্তো নামক ত্রয়োদশ শতকের এক শিল্পীর আঁকা ছবিতে যীশুখ্রীস্ট এবং তাঁর শিষ্যবর্গের চেহারায় স্বাভাবিক মানুষের রূপ প্রকাশ পায়। যীশু জন্মাবার বহুকাল পূর্বে গ্রীক ভাস্কর্যে অবশ্যই আমরা নিখুঁত মানুষের চেহারা দেখতে পেয়েছি। খ্রীস্টান ধর্মগুরুদের দাপটে 'মানুষ' বিলুপ্ত হয়েছিল আর্ট থেকে। আবার সে ফিরে আসে জিওত্তোর রচনায়। তারপর, আরও প্রায় 200 বছর পর, জিওত্তোর পদানুসরণ করে ইতালীর ফ্লোরেন্স শহরে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি শুরু করেন, শুধু মানুষেরই স্বাভাবিক আকৃতি নয়, আমাদের আশেপাশের সব কিছু বিষয়বস্তু, গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদিরও প্রাণবন্ত রূপের উপস্থাপনা। লিওনার্দোর দলে ভিড়লেন মিকেলাঞ্জেলো এবং রাফেল। এ প্রস্তাব পৌঁছাল ভেনিসেও। এই আন্দোলনেরই নাম রনেসাঁস—'র'এর মানে পুনঃ, জেসাঁস মানে জন্ম। অর্থাৎ স্বাভাবিকত্বের পুনর্জন্ম। পুনঃ কেন? না—ঐ যে বলেছি গ্রীক শিল্পে মানুষকে তার অবিকৃত চেহারায় দেখা গিয়েছে, তারই পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল রনেসাঁস আন্দোলনে। কিন্তু মিকেলাঞ্জেলো তৃপ্ত থাকতে পারলেন না, তিনি তাঁর উপলব্ধি এবং বক্তব্য প্রকাশ করতে কিছু কল্পনার আশ্রয় নিলেন, দর্শককে বুঝিয়ে বলতে কোথাও কোথাও বাড়িয়ে বললেন, যেমন নাটকে আমরা দেখেছি অভিনেতা কখনও কখনও একটু বেশী অঙ্গভঙ্গী করেন অথবা গলার স্বর অস্বাভাবিক চড়িয়ে কাঁপিয়ে কিংবা জমিয়ে কথা বলেন। মিকেলাঞ্জেলোর এই নাটকই পরবর্তী যুগের ইতালীয় ডাচ্, ফ্লেমিশ এবং স্প্যানিয়ার্ড শিল্পীদের কাজে দেখা দিল আরও চড়া ভাবে। পণ্ডিতেরা নাম দিলেন এ আর্টের—বারোক।

এই বারোক রীতিতে নাটক রচনার প্রভাব পড়ল রেমব্রাণ্টের ওপর। রেমব্রাণ্ট প্রতিকৃতি আঁকার কাজ পেলেও তা সব সময় নাটকীয় ভাবে আঁকা হতে থাকল। রেমব্রাণ্টের আঁকা বিখ্যাত একটি ছবি আছে—নাইট ওয়াচমেন। রাত্রে শহর পাহারা দেবার একটা প্রথা ছিল ইউরোপের সব দেশেই। এখানে আমরা যেমন চোরের উপদ্রব ঠেকাতে দল বেঁধে পাড়া পাহারা দিই, তারই কিছুটা সামরিক চেহারা বলতে পারো। আমস্টারডাম শহরের উচ্চবংশজাত কতিপয় সখের পাহারা-দারের মনে বাসনা জাগে রেমব্রাণ্টকে দিয়ে তাঁদের একটি গ্রুপ ছবি আঁকাবেন। তখন তো আর ফটো তোলার ক্যামেরা আবিষ্কার হয় নি, ঐ জাতের বাসনা চরিতার্থ করতে আর্টিস্টদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মোটা অর্থের কাজ, রেমব্রাণ্ট রাজী হয়ে গেলেন। এ এক মহা সুযোগ নতুন কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার। এক সাথে অতগুলি মানুষের প্রতিকৃতি আঁকতে হবে। রেমব্রাণ্টের মাথায় খেলে গেল কিয়ারসক্যুরো। পথিকৃৎ শিল্পী কারা-ভাগিত্তর ছবিতে দেখেছেন তিনি কিয়ারসক্যুরো। ঐ গ্রুপ ছবিতে কিয়ারসক্যুরো ফলাতে হবে। ব্যাপারটা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক। আলো আঁধারের পরীক্ষা নিরীক্ষা। আলোর

রশ্মি অস্বচ্ছ বাধা ভেদ করে অন্য পারে যেতে পারে না; এবং যে দিক থেকে আলো পড়বে বাধার অন্যদিকে সৃষ্টি হবে আঁধার বা ছায়া। আলোর তেজ যদি বেশী বাড়িয়ে দেওয়া যায় এবং ছায়ার ঘনত্বও যদি জমাট করে ছবি আঁকা যায় এক নাটকীয় দৃশ্যের হবে অবতারণা। আধা সামরিক বাহিনীটির নেতা ছিলেন ফ্রানস ব্যানিং কক। ছবিটি শেষ হবার পর ব্যানিং কক তো রেগে কাঁই। তাঁর প্রতিকৃতি ঠিক মেলেনি। অন্যদেরও প্রতিকৃতি মেলেনি। মিলবে কেমন করে? প্রতিকৃতি মেলানর দিকে তো রেমব্রান্টের দৃষ্টি ছিল না। তাঁর চিন্তা কিয়ারসক্যুরো। অসাধারণ কিয়ারসক্যুরো। কিন্তু ব্যানিং কক এবং তাঁর বন্ধুদের ঘটে সে বুদ্ধি ছিল না, ছবিটি প্রত্যাখ্যাত হল। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম চিত্রকলা নাইটওয়াচ মেন রইল পড়ে রেমব্রান্টের স্টুডিও-তে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বলডুইন ব্রাউন ছবিটির সমীক্ষা করে বলেছেন, এ রাত্রের ঘটনাই নয়। দিনের বেলার ঘটনা। যেভাবে ক্যাপটেনের হাতের ছায়া পড়েছে পার্শ্ববর্তী জওয়ানটির গায়ে তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় মাথার ওপর সূর্যদেব। চারপাশের জমাট আঁধার রেমব্রন্টে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র নাটক রচনা করার উদ্দেশ্যে। রেমব্রান্টের পূর্বসূরী আরেক দিকপাল ফ্রান্স হালও ঐ জাতীয় একটি রচনা উপস্থাপন করেছিলেন—সেন্ট আদ্রিয়ানের একদল তীরন্দাজ। কিন্তু আলোআঁধারির নাটক জমে রেমব্রান্টের রচনায় অনেক বেশী।

যে-শিল্পী স্বয়ং প্রতিভা, যাকে ইংরাজীতে বলা হয় জিনিয়াস, তাঁকে দিয়ে ফরমাস মত ছবি আঁকান সম্ভব নয়—একালে সে সত্য অনেকে উপলব্ধি করতে পারলেও সেকালে রেমব্রান্টকে বোঝার মত মানুষ ছিল কোথায়? রেমব্রান্টের মাথায় তখন শুধু কিয়ারসক্যুরো। বড়লোকেরা তাঁকে নিযুক্ত করবেন তাঁর কিয়ারসক্যুরো দেখার জন্যে নিশ্চয় নয়, মক্কেলরা সরে পড়লেন, শুরু হল অনটন, সংসার চলা দায়। শ্বশুরবাড়ির সাথেও রেমব্রান্টের সম্পর্ক ভাল ছিল না। নাইট-ওয়াচ মেন নাটকের পূর্বেই রেমব্রান্ট আঁকেন কয়েকটি ছবি, স্ত্রী সাসকিয়া সেখানে ডিলাইলা এবং নিজে—স্যামসন। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়েরা সব ফিলিস্টিনের দল। গোলমাল বাঁধবে না? সাসকিয়া মারা যাবার পর ঘটল নাইট ওয়াচ মেন, ফরাসী নাম র'দ দ নুই ঘটনা। তারপর রেমব্রান্ট দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন হেনড্রিকস নাম্নী তাঁরই পরিচারিকাকে। আর যায় কোথা, সাসকিয়ার আত্মীয়রা কোমর বেঁধে লাগলেন তখন রেমব্রান্টের পেছনে। তাকে একঘরে করতে হবে, দেশ ছাড়া করতে হবে। বড় বংশের ছেলে হয়ে ছোট ঘরের মেয়েকে বিয়ে করা? কী অন্যায়! কী অন্যায়! কিন্তু রেমব্রান্টের কাছে ছোট ঘর বড় ঘর কিছু ছিল না। হেনড্রিকস যে কী ভাবে সাহায্য করেছিল রেমব্রান্টকে তা বলে বোঝান যায় না। রেমব্রান্টের যখন চরম আর্থিক সঙ্কট চলেছে হেনড্রিকস সংসার চালিয়েছে রোজগার করে এনে। শুধু তাই নয়, সে সাসকিয়ার পুত্র টিটাসকে আপন পুত্রের মতই স্নেহ করত, যত্ন করত।

অন্য কেউ রেমব্রান্টকে দিয়ে প্রতিকৃতি আঁকাবে না কিন্তু রেমব্রান্টের প্রতিকৃতি আঁকা থেমে থাকল না, প্রতিকৃতি এঁকে রোজগার বন্ধ বটে, কিন্তু আর্ট সাধনা বন্ধ হল না। তিনি নিজ প্রতিকৃতি আঁকলেন বার বার। হেনড্রিকস-এর প্রতিকৃতি আঁকলেন, টিটাস-এর প্রতিকৃতি আঁকলেন এবং সেই প্রতিকৃতির মধ্যেই সোচ্চার হল কিয়ারসক্যুরো—তাল তাল আলো আর তাল তাল ঘন ছায়ার সমন্বয়। এক সময় রেমব্রান্টের আঁকার ধারা ছিল—ছোট খাট সব ডিটেইল তুলে ধরা, আর ছোট ছোট টানটোনে রঙ জমান। কিন্তু পরবর্তী কাজে ঐ আঙ্গিক দেখা যায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মোটা ব্রাসে, মোটা টানে আলো ছায়া খেলিয়ে অসাধারণ সব চিত্র-ব্যঞ্জনা। ডিটেইলড কাজের সমঝদাররা এ নতুন আঙ্গিকের উৎকর্ষ উপলব্ধি করতে পারলেন না। তা পারবেন কেমন করে, রেমব্রান্ট যে সময়ের থেকে অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যাঁরা বেশী এগিয়ে গেছেন সময়ের থেকে তাঁদের অনেক বাধা পেতে হয়েছে, দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, লাঞ্ছিতও হতে হয়েছে। রেমব্রান্ট ছিলেন সেই মুষ্টিমেয় মানুষের অন্যতম যাঁরা নতুন পথের এবং নতুন মতের সন্ধান দিয়েছেন। রেমব্রান্টকে বুঝতে কলারসিকদের কিছুটা সময় লেগেছিল বটে, কিন্তু তিনি জগৎবরেণ্য হলেনই শেষ পর্যন্ত। বুদ্ধিমান আর শিক্ষিত মানুষ তাঁকে মাথায় তুলে নিলেন। সরকারী মহলও তাঁর সামনে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হলেন। যে সব প্রতিকৃতি এবং অন্য রচনাও অবহেলায় পড়েছিল ধুলোপড়া অবস্থায় তাঁর স্টুডিওয়ে বিদগ্ধরা এসে সেগুলির প্রশংসায় হলেন পঞ্চমুখ। আবার এল 1661 সালে এক মস্তবড় কাপড় কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারীদের গ্রুপ ছবির অর্ডার। সবাই তখন সেই কিয়ারসক্যুরোই দেখতে চায়। অদৃষ্টের পরিহাস, কিয়ারসক্যুরোই তাঁকে দিয়েছিল সরিয়ে তাঁর আসন থেকে আবার সেই কিয়ার-সক্যুরোই তাঁকে বসাল সিংহাসনে রাজার মুকুট পরিয়ে। রেমব্রান্টের জয়জয়কার তখন সারা নেদারল্যাণ্ডে।

একটি বিষয় লক্ষ্য করার, রেমব্রান্টের রচনায় কী ল্যাণ্ডস্কেপ, কী পোরট্রেট, কী স্টিল লাইফ রেয়ালিসম-এর চূড়ান্ত। সারা ইউরোপে তখনও হচ্ছে রাজপুরুষদের মন রেখে আর ধর্মীয়গুরুদের ফরমাস মত ছবি আঁকা। রুবেন্স-এর মত সমস্ত শিল্পীও ভিন্ন পথে পা বাড়াতে সাহস পাননি। নেদারল্যাণ্ডে তখন গুটিকয়েক তরুণ শিল্পীর অগ্রভাগে চলেছেন রেমব্রান্ট—আঁকছেন সাধারণ নাগরিকদের, ছবি উঠছে গিয়ে নাগরিকদেরই ঘরে। এ দলের কোনও কোনও রচনায় ধর্মে অনুরাগ অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে। তা হলেও মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্তরাই এঁদের

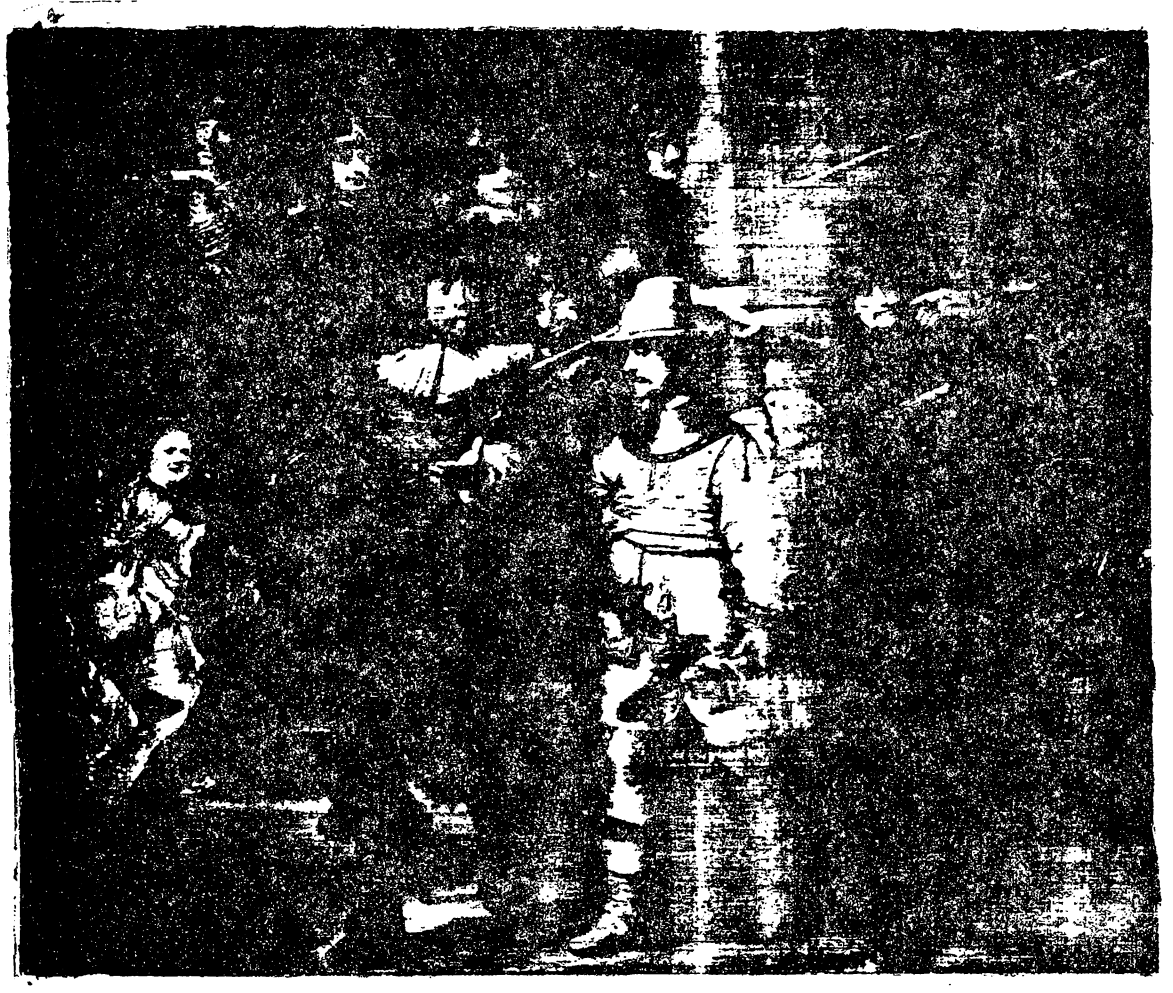

তীব্র আলো আঁধারিতে রেমব্রান্টের আঁকা ছবি নাইট ওয়াচমেন।

ছিল প্রধান লক্ষ্য। প্রোটেস্টান্ট চার্চের দাপট অগ্রাহ্য করে সাধারণকে নিয়ে মেতে ওঠার সাহস একমাত্র ছিল রেমব্রান্টেরই। ফ্রান্সে আরও প্রায় দুশ বছর পর, তখন না আছে কোনও রাজা, না আছে পাদরীদের হাঁকডাক, ইমপ্রেসনিস্ট শিল্পীরা তুচ্ছ নাগরিকদের এনে বসিয়েছিলেন সাদরে তাঁদের রচনায়। কিন্তু 17 শতকে ঐ চিন্তাধারা দুঃসাহস নয়? অর্থের অভবে রইল না, সম্মানও খুব, কিন্তু দুঃখ দিয়েই রেমব্রান্টের জীবনটা গড়া, প্রিয়তমা হেনড্রিকস মারা গেলেন। পুত্র টিটাস যৌবনেই ইহলোক ত্যাগ করল। রেমব্রান্ট রইলেন একা শেষের কটা বছর। শোকে জর্জরিত রেমব্রান্টের অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি আর নেই, আর কত যুদ্ধ করবেন তিনি? দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, লড়াই করেছেন শোকের সঙ্গে সব যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়ে 4 অক্টোবর 1669, রেমব্রান্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। নেদারল্যাণ্ডের, বলতে গেলে, সব মনীষীর শ্রেষ্ঠ রেমব্রান্ট চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে কবে যে তা জানা সম্ভব হত না যদি না সেটি আমস্টারডামের ওয়েস্টার-কার্ক গোরস্থানে কবরস্থ ব্যক্তিদের তালিকায় উল্লেখ থাকত। তার মানে, না তাঁর গুণগ্রাহীরা না, তাঁরশত্রুরা খবর রেখে-ছিলেন, কবে তিনি অসুস্থ হলেন কবেই বা মারা গেলেন। মহাশিল্পীর কী পরিণাম! কিন্তু আজকের নেদারল্যাণ্ড-বাসীর কত গর্ব রেমব্রান্টকে নিয়ে। কত লেখা, কত গবেষণা রেমব্রান্টের বিষয়ে। কত মিউজিয়াম আর কত গ্যালারীতে তাঁর কীর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

আমার গোড়ার কথায় ফিরে আসি, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন। আলোর বিজ্ঞান পদার্থবিদ্যার মধ্যে পড়ে। কিয়ারসক্যুরো আলো বিজ্ঞানের অঙ্গ, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। রসায়নের ভূমিকাও চিত্রকলায় অনস্বীকার্য। পরে তা নিয়ে কিছু কাহিনী বলবার ইচ্ছা রইল।

[সাত] নরবানরের শহর

সারাটা দিন কেউ আর আমাদের ঘাঁটাতে এল না। সন্ধের দিকে খাবার দিয়ে গেল গরিলারা। যাবার সময়ে আলো নিভিয়ে গেল খাঁচার। ভাল ঘুম হল না সে রাতে। খড়ের বিছানায় শুয়ে আরাম পেলাম বটে, কিন্তু বাঁদরগুলোর সঙ্গে কথা বলতে না পারার ক্ষোভে ঘুম উড়ে গেল চোখ থেকে। ঠিক করলাম, এখন থেকে আর মেজাজ খারাপ করা চলবে না। সুযোগ পেলেই দেখাতে হবে আমার মনের ক্ষমতা। গরিলা ওয়ার্ডার দুজন আমার ভাবসাব দেখে কিছু বুঝতে না পারলেও নিশ্চয় আরও সভ্য নরবানর আছে এই গ্রহে—এই হাসপাতালেই। যেমন করেই হোক, যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে তাদের সঙ্গে।

পরের দিন সকালে দেখলাম আমার এই অনুমান অমূলক নয়। ঘুম ভাঙার পর ঘণ্টাখানেক ধরে দেখে গেলাম, অন্যান্য খাঁচায় বেশির ভাগ মানুষই পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত পায়চারি করে চলেছে। নিজেও যে তাই করে চলেছি অজ্ঞাতসারে, তা টের পেয়েই লজ্জা পেলাম। এক কোণে ধীর স্থির ভাবে বসে রইলাম। ঠিক সেই সময়ে খুলে গেল করিডরের দরজা। দুজন ওয়ার্ডারের সঙ্গে ভেতরে এল নতুন এক মূর্তি। একজন মেয়ে শিম্পাঞ্জী। নিশ্চয় গুরুত্ব-পূর্ণ পদের অধিকারিণী। তাই সসম্ভ্রমে ওয়ার্ডার দুজন এল পেছন পেছন।

ওয়ার্ডার দুজন নিশ্চয় আমার কথা বলেছিল মেয়ে শিম্পাঞ্জীটাকে। কেননা, করিডরে ঢুকেই প্রশ্ন করল দুই গরিলাকে। একজন আঙুল তুলে দেখাল আমার খাঁচার দিকে। সোজা আমার খাঁচার দিকেই এগিয়ে এল শ্বেতবসনা মেয়ে শিম্পাঞ্জী।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখতে লাগলাম দূর থেকেই। গরিলা দুজনের মত সাদা পোশাক রয়েছে এর গায়ে। কিন্তু অনেক বেশি পরিপাটি। কোমরে বেল্ট। হাতা খাটো। চটপটে দুই বাহু ঝুলছে হাতার ভেতর থেকে। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম তার চোখ মুখের ভাব দেখে। অসাধারণ রকমের বুদ্ধিদীপ্ত আর সচকিত। শুভ লক্ষণ। ভাব জমাতে বেশি বেগ পেতে হবে না। সাদা চোয়াল ঘিরে নরবানর সুলভ চামড়ার ভাঁজ রয়েছে বটে, বয়স কিন্তু বেশ কম বলেই মনে হল। এক হাতে রয়েছে চামড়ার ব্রীফকেস।

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানালাম—"গুড ডে, ম্যাডাম।"

খুব মৃদু কণ্ঠে বলেছিলাম কথাটা। তীব্র বিস্ময় ভাব ফুটে উঠল মেয়ে শিম্পাঞ্জীর চোখে মুখে। কিন্তু সংযত রাখল নিজেকে। ভারিক্কী চালে হাত নেড়ে চুপচাপ থাকতে বলল গরিলা ওয়ার্ডার দুজনকেও। মহাবিস্ময়ে বকবকানি শুরু করে দিয়েছিল দুজনেই।

উৎসাহ পেলাম। ক্ষীণভাবে যদিও। বললাম—"ম্যাডাম, এরকম বিদিগিচ্ছিরি ভাবে আপনার সামনে হাজির হতে হচ্ছে বলে খুবই দুঃখিত। বিশ্বাস করুন, এ অভ্যেস আমার নেই—"

যা মুখে এল, তাই বলে গেলাম। শুধু কথা বলার জন্যেই বলে গেলাম। গলার সুরটা কেবল সংযত, ভদ্রস্থ রাখলাম। মাঝে মাঝে মুচকি মুচকি হেসেও নিলাম। হাসি এবং কথা শেষ করার পর দেখলাম একেবারে থ হয়ে গেছে মেয়ে-শিম্পাঞ্জীটা। ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলছে, প্রকটতর হয়েছে কপালের বলিরেখা। বেশ বুঝলাম, প্রাণপণে চেষ্টা করছে অতি দুরূহ একটা সমস্যার সমাধান বার করার। বেশ কিছুক্ষণ পরে, তাকাল আমার পানে। মনে হল, রহস্যের একটা দিক বোধহয় ধরতে পেরেছে। অথবা, আঁচ করেছে।

খাঁচায় বন্দী মানুষগুলোকে দেখেছি আমার গলার আওয়াজ শুনলেই ক্ষেপে উঠতে। কিন্তু এই প্রথম লক্ষ্য করলাম, যতক্ষণ কথা বলে গেলাম, ততক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমার পানে। কৌতূহল বস্তুটা তাহলে আছে এদের মধ্যে। প্রত্যেকেই গরাদে মুখ চেপে ধরে, নির্নিমেষে চেয়ে আমার দিকে।

পকেট থেকে ফাউন্টেন পেন বার করল মেয়ে শিম্পাঞ্জী। অনেক কিছু লিখল সেই বইতে। তারপর মাথা তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল আমার সঙ্গে। হাসল আবার সেই আন্তরিক হাসি। আরও উৎসাহ পেলাম। আমার উদ্বিগ্ন চাহনি দেখেই যখন অভয় হাসি হেসেছে, তখন হাত বাড়িয়ে দিয়েই দেখা যাক কি হয়।

গরাদের ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দিলাম ডান হাতটা। প্রথমটা চমকে গেল মেয়ে-শিম্পাঞ্জী। এক পা পেছিয়েও গেল। পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। চোখে চোখ রেখে এগিয়ে এল একটু—একটু করে। এক হাত বাড়িয়ে রাখল আমার হাতের ওপর। লোমশহাতের অদ্ভুত লম্বা আঙুলগুলো বুঝলাম কাঁপছে থিরথির করে। নড়লাম না—পাছে ভয় পায়। আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে নিল সে বিজয় হাসি হেসে তাকাল গরিলা ওয়ার্ডারদের দিকে।

আশায় আনন্দে প্রায় দম আটকে এল আমার। নিশ্চয় আমি কি ধরনের মানুষ, তা বুঝতে পেরেছে। চড়া গলায় কথা বলে গেল একজন গরিলা ওয়ার্ডারের সঙ্গে। ধমক দিচ্ছে। বোধ হয় খুলে দিতে বলছে আমার খাঁচার দরজা। কিন্তু হায়রে! তাতো নয়। পকেট হাতড়ে সাদা মত একটা ডেলা বার করল গরিলা ওয়ার্ডার, দিল মেয়ে-শিম্পাঞ্জীর হাতে। মিষ্টি হেসে বস্তুটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল শিম্পাঞ্জী-ললনা।

জিনিসটা এক ডেলা চিনি।

ভীষণ হতাশায় মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল। আর একটু হলে চিনির ডেলা ছুঁড়ে মারতাম মুখের ওপর, সামলে নিলাম অতি কষ্টে। পণ করেছি না, মাথা গরম করব না? শান্ত ভাবে হাত পেতে নিলাম চিনির ডেলা। মুখে পুরে কচমচ করে খেলাম ধীমানজীবের মত।

এইভাবেই প্রথম আলাপ ঘটেছিল জিরার সঙ্গে। পরে জেনেছিলাম, জিরা নামেই ডাকা হয় মেয়ে-শিম্পাঞ্জীটাকে। যে দপ্তরে আমাকে আনা হয়েছে, জিরা সেখানকার প্রধান। হতাশ হলেও মনে ক্ষীণ আশা ছিল, একদিন না একদিন জিরার সঙ্গে ভাব বিনিময় করবই। অনেকক্ষণ ধরে গরিলা ওয়ার্ডারদের সঙ্গে কথা বলে গেল জিরা। যেন, আমার ব্যাপারেই নির্দেশ দিয়ে গেল। তারপর নোটবই মুড়ে গেল অন্য খাঁচাগুলো দেখতে।

প্রত্যেক খাঁচায় নবাগতদের দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বেশ কিছু লিখল নোট বইতে। স্পর্শ করল না কাউকেই। সবশেষে গেল বাচ্চাদের খাঁচার সামনে। বেশ কিছু চিনির ডেলা ছুঁড়ে দিল ভেতরে।

মানুষ নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট

দ্বিতীয় দিনটা কেটে গেল প্রথম দিনের মতই। গরিলা ওয়ার্ডাররা আর আমাদের ঘাঁটায়নি—শুধু খাবার এনে দিয়েছে। পরের দিন বেশ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করা হল আমাদের নিয়ে। স্মৃতির পাতায় এখনো তা জ্বল জ্বল করছে। খুবই অপমানকর পরীক্ষা—অন্তত আমার কাছে।

বিশদ লিখে কি হবে? পাভলভ কুকুর নিয়ে যেভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, সেই ধরনের দুটি পরীক্ষা হল পর পর দুদিন। প্রথম দিন হুইশল বাজাল একজন গরিলা ওয়ার্ডার—আর একজন খাঁচার সামনে দোলাতে লাগল একটা কলা। দেখা হল, বন্দী মানুষদের মুখে লালা কাটছে কিনা। তারপর শুধু বাঁশি বাজালেই লালা কাটতে লাগল—কলার লোভে। একেই বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলে, কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স।

দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজান হল খাঁচার বাইরে। ঘণ্টার সঙ্গে লাগানো তারে যুক্ত চুম্বক লাগানো রইল গরাদে। ষণ্ডামার্কা একটা লোক ঘণ্টার আওয়াজ শুনেই দৌড়ে এসে গরাদ চেপে ধরতেই ছিটকে পড়ল দূরে। এই রকম চলল বারবার। তারপর আর চুম্বক লাগানোর দরকার হল না। শুধু ঘণ্টার আওয়াজ শুনলেই ছিটকে যেতে লাগল ষণ্ডামার্কা মানুষটা—যন্ত্রণার ভয়ে।

ইতর প্রাণীদের নিয়েই এ ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা হয়। রাগে অপমানে গা রি-রি করলেও চুপ করে রইলাম আমি।

দ্বিতীয় দিনের বিকেলের দিকে এল জনাকয়েক নতুন নরবানর।

প্রথমজন একজন ওরাংওটাং। সোরোর গ্রহে এই প্রথম ওরাংওটাং দেখলাম আমি। অবাক হলাম তার চালচলন চেহারাচরণ দেখে। বিজ্ঞতাপস, সৌম্য ঋষি, পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাদিগগজের মত হাবভাব। দু'হাত অতিশয় দীর্ঘ। মাটি ছুঁয়ে ফেলেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন এক জোড়া লাঠি নিয়ে হাঁটছে। পরনে কোট প্যাণ্ট। ভীষণ হামবড়াই, নাক উঁচু।

ঠিক পেছনেই ভারী ব্রীফকেস নিয়ে একজন খুদে মেয়ে শিম্পাঞ্জী। নিশ্চয় পণ্ডিত ওরাংওটাংয়ের সেক্রেটারী। কাগজপত্র নিয়ে বেজায় উদ্বিগ্ন।

তারও পেছনে জিরা। আর দুজন গরিলা ওয়ার্ডার। হাতে যন্ত্রপাতি। আরও এক্সপেরিমেণ্ট হবে নাকি?

রকমসকম দেখে কিন্তু তাই মনে হল। পণ্ডিত ওরাংওটাং-এর মাথায় লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল। মাথা ঝুলে রয়েছে বুকের ওপর। যেন সর্বদাই ধ্যান মগ্ন। কালোকোটের ওপর একটা লাল তারা। সাদাকালো ডোরাকাটা ট্রাউজার্স ধূলিমলিন। জিরা সসম্ভ্রমে চেয়ে রয়েছে তার দিকে যেন হুকুমের প্রতীক্ষায়। হুকুমটা এল হঠাৎ। আচমকা যেন ধ্যান

ভেঙে গেল ওরাংওটাং-এর। তাকাল জিরার দিকে। চাহনিটা হুকুম। মুখে কিছু বলতে হল না।

জিরা ইসারায় দেখিয়ে দিল আমার খাঁচা। পুরো দলটা সটান এগিয়ে এল আমার দিকেই।

আমার দিকেই তো আসবে। এখানে আমি ছাড়া দেখবার মত মানুষ কি আর আছে?

আকর্ণ হেসে অভ্যর্থনা জানালাম। দরাজ গলায় স্বাগতম শোনালাম।

বললাম আসুন, মাই ডিয়ার ওরাংওটাং! আপনার মত বুদ্ধিমান একটা জানোয়ারের দেখা পেয়ে বড়ই খুশি হলাম। খুশি আপনিও নিশ্চয় হয়েছেন—আপনার চাইতেও বুদ্ধিমান জানোয়ার দেখে?

আমার গলার আওয়াজ শোনামাত্র দুচোখের পাতা পুরোপুরি খুলে গেল ওরাংওটাংয়ের—ঢুলুঢুলু চাহনি উড়ে গেল চক্ষের নিমেষে। ভীষণ চমকে উঠে খচমচ করে কান চুলকল কিছুক্ষণ। সন্দিগ্ধ চোখে কিন্তু দেখতে লাগলো খাঁচার আগাপাশতলা—যেন আওয়াজটা আসছে খাঁচার গা থেকে—নিশ্চয় কারচুপি আছে কোথাও।

জিরা বোধহয় আঁচ করল ব্যাপারটা। পকেট থেকে বার করল অনেক নোট বই। পড়ে শোনাল আমার ইতিবৃত্ত।

কিন্তু বেশ দেখা গেল একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। ওরাংওটাং বিশ্বাস করানোর অনেক চেষ্টা করে গেল জিরা। হামবড়াই কায়দায় কাঁধ, ঝাঁকিয়ে দু' চার কথায় জিরাকে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল পণ্ডিত ওরাংওটাং। দুহাত

পেছনে মুষ্টিবদ্ধ করে, পায়চারি করতে লাগল আমার খাঁচার সামনে। ঘনঘন চাইতে লাগল আমার দিকে। ক্রূর চাহনি, বন্ধুত্বের বাষ্পটুকুও নেই চোখের মধ্যে। অন্যান্য নরবানররা সসম্ভ্রমে শুধু চেয়েই রইল —ভাবখানা, হুকুমটা, মুখ থেকে খসলেই হয়।

সম্ভ্রমবোধটা যে সেকি, তা একটু পরেই টের পেলাম। আড়চোখে মুচকি হাসল একজন গরিলা ওয়ার্ডার। একই ভাবে জবাব দিল অপরজন। নীরবে টিটকিরি দিচ্ছে ওরাংওটাংকে!

দেখে টিটকিরি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারিলাম না আমিও। একই কায়দায় পেছনে দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে পায়চারি করতে লাগলাম খাঁচার মধ্যে। ঘনঘন চাইতে লাগলাম ওরাংওটাং-এর দিকে।

হাসি চাপতে গিয়ে দম আটকে এল গরিলা দুজনের। অতিকষ্টে গম্ভীর হয়ে রইল জিরা। শিম্পাঞ্জী সেক্রেটারী তাড়াতাড়ি ব্রীফকেস খুলে মুখ আড়াল করে হেসে নিল একচোট।

ভেংচি কাটার আনন্দটা মিলিয়ে গেল পরক্ষণেই। বুঝলাম বিপদ ঘটতে পারে। খেপেছে ওরাংওটাং। দুই দাবড়ানি দিয়ে উৎকট গম্ভীর করে তুলল চার স্যাঙাৎকে। তারপর আমার সামনে দাঁড়িয়ে ডিকটেশন দিয়ে গেল সেক্রেটারীকে।

ডিকটেশন চলল বেশ কিছুক্ষণ। সেইসঙ্গে গাম্ভীরি চালে হাত ছোঁড়া। কাঁহাতক সহ্য করা যায়? বুদ্ধিমান মানুষ না আমি? বুদ্ধির একটু নমুনা দেব ঠিক করলাম।

বললাম—মি জেয়াস।

আগেই লক্ষ্য করেছিলাম, অনুগতরা একে কিছু বলার আগে মি জেয়াস বলছে। পরে জেনেছিলাম, ওরাংওটাংটার নাম জেয়াস, মি হল তার উপাধি।

ভড়কে গেল সবকটা নরবানর। হাসবার ক্ষমতাও আর নেই কারোর। সবচেয়ে ভ্যাবচাকা খেয়েছে দেখলাম জিরা।

সুযোগটা নষ্ট করলাম না। জিরার দিকে আঙুল তুলে বললাম জিরা।

লাল হয়ে গেল জিরার সাদা চোয়াল। ওরাংওটাং সম্বিৎ ফিরে পেল বেশ কিছুক্ষণ পর, আবার শুরু হল পায়চারি। সেইসঙ্গে কাঁধ ঝাঁকুনি। যেন, নিজের দুটো কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

পা টনটন করার জন্যেই বোধহয় পায়চারি বন্ধ করল। মহাপণ্ডিত ওরাংওটাং। দলবলকে হুকুম দিলে, যন্ত্রপাতি সাজিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট চালু হোক—এত দেরি কেন? ভাষা না বুঝলেও, ভাবসাব দেখে সবই বুঝলাম।

শুরুহল এক্সপেরিমেণ্ট'। পশুদের দিয়ে যে এক্সপেরিমেণ্ট হয় পৃথিবীতে, সেই ধরনের নানারকম এক্সপেরিমেণ্ট। পাশ করে গেলাম সব কটাতেই।

কিন্তু ঘেমে নেয়ে গেল জেয়াস আর জিরা। অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখে, দ্বিতীয় জন স্রেফ উদ্বেগে। দুজনেই রুমাল বার করে ঘাম মুছতে লাগল কপালের।

তারপরেই দেখলাম রাগে ফুসছে ওরাংওটাং। পরীক্ষায় পাশ করে যাওয়ায় খুশি হয়নি। কটমট করে আমার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। জিরাকে বেশ কয়েকটা হুকুম দিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল বাইরে। পেছনে সেক্রেটারী।

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জিরা। গরিলা ওয়ার্ডার দুজনকে বুঝিয়ে দিল কি-কি করতে হবে। যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে তারা বেরিয়ে গেল বাইরে। বুঝলাম আজকের মত রেহাই দেওয়া হল আমাকে।

খাঁচার সামনে এসে দাঁড়াল জিরা। নীরবে চেয়ে রইল আমার দিকে, গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম। ফিসফিস করে বললাম—জিরা। জিরা!

হাত চেপে ধরল জিরা হাত আর কাঁপছে না। চোখ উজ্জ্বল। চোয়াল লাল। [ক্রমশঃ]

কলিকাতা পুস্তক মেলার 510 নং স্টল

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার

নতুন ও পুরানো সংখ্যা পাওয়া যাবে

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ॥ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ইউরোপ সেভের

শঙ্কর ঘটক

'নিকোলাসের চিঠিটা পেয়েই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে সম্পূর্ণ ব্যাপারটির মধ্যে মস্ত বড়ো ধোঁকাবাজি আছে।'

অনুকূল ওর ফোলিও ব্যাগটা খুলে একটা দোমড়ানো খাম বার করে। খামটি খুলে একটা চিঠি বার করে সে আমায় পড়তে দিল। দুর্বোধ্য হাতের লেখা, তার ওপর আবার জল পড়ে জায়গায় জায়গায় কালি লেপ্‌টে গেছে। কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করে চিঠিটা আবার আমি ওর হাতেই ফিরিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে বাবা আর দিদি এসে গেছে।

—নিকোলাস কি লিখেছে নিজের চোখেই ত তুই দেখলি। আড়াই লক্ষ ল্যাংড়া আমগাছের চারা চাই। কলমের গাছ। তার জন্য সে আমাকে আড়াই লক্ষ টাকা দেবে। লেবার খরচ ওর। এক বছরের মধ্যে সরবরাহ করতে হবে।

—দামটা খুবই কম। দিদি বলল।

—সেকথা আমিও ওকে জানিয়েছিলাম। তার উত্তরে দরাজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সে। টাকার ভাবনা নেই। কিন্তু সরেস মালটি তার চাই। প্রশ্নটা সেখানে নয়। প্রশ্ন হল অত আমগাছের চারা দিয়ে সে করবেটা কি?

আমি তখন মেক্সিকোর সেলিনা ক্রুজ বন্দরে প্রফেসার লিণ্ডোয়ালের তত্ত্বাবধানে রাসায়নিক ক্ষয় সংক্রান্ত গবেষণায় ব্যস্ত। একদিন ভোরে নিকোলাসের ফোন। সেলিনা ক্রুজে আগের রাতে সে পা দিয়েছে। কোনরকমে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করেই সে আমায় ফোন করেছে।

—গুড মর্নিং ডক্টর দাস!

—মর্ণিং। কি খবর?

—তোমার সংগে আমার অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন।

—তা ত বুঝতেই পারছি। চলে এসো আমার ফ্ল্যাটে। একাই আছি।

ঘড়ির বড়োকাঁটা এক চক্কর ঘোরার আগেই নিকোলাস এসে হাজির।

—চিঠি পেয়েছো আমার?

—অলবাৎ। যথা সময়েই পেয়েছি। তোমার আশায় বসেছিলাম।

—কি করে বুঝলে আমি আসব ?

—তোমাকে খুব ভালোরকম চিনি বলে। বিনা প্রয়োজনে কাউকে চিঠি লেখার বদ অভ্যেস ত তোমার নেই!

হো হো করে হেসে ওঠে নিকোলাস।

—ঠিকই ধরেছ। আসলে এত কাজে ব্যস্ত থাকি যে....

—তা এখন কাদের সংগে যুক্ত হেক্সাগন না হেপ্টাগন ?

—না ভাই। কোন কাজেই আর নেই আমি। কোণের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই। এখন আমি বৃত্তে বিরাজমান। শুধু ঘুরছি আর ঘুরছি।

—হঠাৎ এমন ঘোরারোগে ধরল কেন তোমার ?

—সে কথাই ত বলতে এসেছি। জানই ত আমি একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। গাছপালা নিয়ে গবেষণা করাই আমার কাজ। বর্তমানে আমি ফ্রান্সে ল্যাংড়া আমের গাছ তৈরী করে তাতে আম ফলানোর কাজে ব্যস্ত। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তোমাদের দেশের মত আম এখানে ফলাতে পারছি না। কাঁচের ঘর তৈরী করে তাতে ভারতবর্ষের মত পরিবেশ তৈরী করেছি, আর্দ্রতা আর উষ্ণতার সংগে হিসেব মতো সূর্যালোক —সব ব্যবস্থা করেছি। তবুও আম হচ্ছে না। মুকুল পর্যন্ত হয়েছে তারপর সব ফুল ঝড়ে যাচ্ছে।

বছর কয়েক আগে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের একটি অধিবেশনে অতিথিদের ল্যাংড়া আম পরিবেশন করা হয়েছিল। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এই রসাল ফলটি নিকোলাসের মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ বলে আমার মনে হল। সেই থেকে সে এই আমের পেছনে লেগে গেছে।

—মঁসিয়ে ব্রুনেভকে জানালাম আমার অসুবিধার কথা। মঁসিয়ে ব্রুনেভ একজন নিউক্লিও বোটানিস্ট। অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটাচ্ছেন তিনি উদ্ভিদ জগতে। ওনার বাগানে তুমি একটাও বিশুদ্ধ গাছ পাবে না। জবের সংগে গমের যুগ্ম গাছ। আপেলের সংগে নেসপাতি। বাতাবিলেবু গাছে বড়ো বড়ো কমলালেবু ঝুলছে। এরকম কত কী। তিনি আমার আম ফলানোর চেষ্টার এমন করুণ পরিণতি দেখে সত্যিই দুঃখ পেলেন।

তারপর আরো পাঁচসাত কথা বলে সে আসল কথাটি পাড়ল।

—আমার আমের চারা কতদূর ?

—আরে এত অতি সহজ কাজ। সময় মতো তুমি তোমার জিনিস পেয়ে যাবে।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল নিকোলাস।

—অসংখ্য ধন্যবাদ তোমায় ডক্টর দাস। ইউরোপে আমের চাষ আমরা করবই। শুধু আমের চাষ নয়, ইউরোপের চরম ঠাণ্ডার দিনগুলোরও অবসান হতে আর দেরী নেই। ইউরোপকে আমি করে তুলব নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল।

উষ্ণ করমর্দন করে চলে গেল নিকোলাস।

নিজেদের কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে নিকোলাসের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আম গাছের চারা পাওয়া এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

নিজের চেম্বারে বসে করোশনের ওপর একটা পেপার পড়ছি। হন্তদন্ত হয়ে প্রফেসার লিণ্ডোয়াল আমার ঘরে ঢুকলেন। সেদিনকারই একটা খবরের কাগজ।

—দেখেছো দাস, কি সাংঘাতিক ঘটনা!

কাগজটা নিয়ে দেখি আমি। সাংঘাতিকই বটে! কংগোর একটা দু-বর্গমাইল এলাকার সমস্ত গাছের পাতা একদিনে ঝড়ে গেছে। ঘন সবুজ অঞ্চলে এখন একটাও পাতা নেই। ন্যাড়া ন্যাড়া গাছের মাথাগুলো উঁচু উঁচু হয়ে আছে। খবরে লিখেছে যে এই ঘটনাটি ঘটার পরে শয়ে শয়ে জন্তুজানোয়ার দিশেহারা হয়ে পালাচ্ছে। সব চাইতে অসহায় অবস্থায় পড়েছে বনের পাখিরা।

—কিভাবে হতে পারে বল দেখি এমনটা ?

—আমিও ত কিছু বুঝতে পারছি না। কোন তেজস্ক্রিয় বিকিরণ কিংবা স্টার ওয়ারের....

—তোমাদের মাথায় কেবল তেজস্ক্রিয় বিকিরণ আর স্টার ওয়ার।

চিন্তাক্লিষ্ট মনে হল প্রফেসরকে।

তার দুদিন পরে।

আবার খবরের কাগজের প্রথম পাতার খবর হল একই জাতের ঘটনার। এবারে হাভানায়। তামাক বাগানের তামাক পাতা ঝড়ে গেছে। বেবাক সাফ। কোটি কোটি টাকা লোকসান।

তারপর পুরো একমাস ধরে এ ঘটনার আরো অনেক খবর পাওয়া গেল। সমস্ত গাছেই কিন্তু পাতা ঝড়ে যাবার পর আবার নতুন পাতা গজাত। অর্থাৎ গাছগুলো মরত না। বিশাল কিছু ক্ষয় ক্ষতি হচ্ছিল না। তেমন কিছু চিন্তারও ছিল না। তবুও বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানী এসব ঘটনায় বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কি কারণ থাকতে পারে এমন ঘটনার ?

প্রফেসার লিণ্ডোয়াল কিন্তু চুপচাপ বসে ছিলেন না। তিনি ফ্রান্সের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী মঁসিয়ে ব্রুনেভকে চিঠি দিলেন।

নিকোলাসও উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। ওর কথা হঠাৎই আমার মনে পড়ল। আমি নিকোলাসের কাছে এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি লিখলাম। আর একই সাথে আর একটি চিঠি দিলাম দিমিত্রভকে। দিমিত্রভকে অবশ্য নিকোলাসের আমচাষ সংক্রান্ত পাগলামোর কথাও জানিয়ে দিলাম।

দিমিত্রভ আমার চিঠির উত্তরে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে নিকোলাসের কাজকর্ম বেশ সন্দেহজনক—"নিকোলাসের যে কোনও দুরভিসন্ধি আছে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু

ঠিক কি তার উদ্দেশ্য সেটা এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না। তুমি অবশ্যই সতর্ক থাকবে। নিকোলাসের সংগে আপাততঃ সহযোগিতা করে তার আস্থাভাজন হয়ে ওর উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করবে।" তারপর তিনি লিখেছেন "বর্তমান পৃথিবীতে এমন অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে যা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। হঠাৎ কেন বিশাল অঞ্চলের গাছের পাতাগুলো রাতারাতি ঝরে যাচ্ছে এ এক বিস্ময়! হয়ত আমাদের ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক কার্যাবলীই এর জন্য দায়ী।"

নিকোলাসের চিঠিটিও গুরুত্বপূর্ণ। "কাগজে কাগজে গাছের পাতা ঝরা নিয়ে বিস্তর জল্পনা কল্পনা চলছে। এক জাতের বিষাক্ত ছত্রাকই এর জন্য দায়ী বলে আমার অনুমান। আমি অবশ্য শ্রদ্ধেয় দিমিত্রভকে এর জন্য দায়ী করছি না। উনি এখন সাইবেরিয়ায় কী জন্য রয়েছেন তা-ও আমি জানি না। তবে সম্ভবতঃ তিনিই পারেন এই সমস্যার সমাধান করতে। শুনেছি উনি এক জাতের ছত্রাক প্রস্তুত করেছেন যেগুলো ভাইরাসের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এগুলো উষ্ণ অঞ্চলে বেশি কার্যকরী হয়।"

দিমিত্রভ নিকোলাসকে সন্দেহ করছেন—নিকোলাস দিমিত্রভকে প্রকারান্তরে দায়ীই করেছেন। দিমিত্রভ আর নিকোলাসের অন্তর্বিরোধের কথা সকলেরই জানা। কিন্তু প্রকাশ্যে এমন ধরনের কথাবার্তা এর আগে এঁরা কেউ বলেন নি। আমি পড়ে গেলাম ধাঁধায়।

প্রফেসর লিণ্ডোয়ালকে আমি দুটো চিঠিই দেখালাম। চিঠি দুটো আদ্যপান্ত পড়ে একটু হাসলেন অধ্যাপক।

—তোমার কি মনে হয় দিমিত্রভের মতো মানুষ যিনি তাঁর সব কিছু উৎসর্গ করেছেন মানবসেবার জন্য, তিনি এমন একটা বিপজ্জনক গবেষণায় হাত দেবেন?

—সেটাইত আমারও প্রশ্ন।

মাথা নীচু করে গভীরভাবে কি ভাবছেন প্রফেসর। হঠাৎ মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক উত্তেজিত কণ্ঠে আমায় বল্লেন ঃ

—এক্ষুনি তুমি একবার ফ্রান্সে যেতে পারবে দাস? সম্ভবতঃ খুব বেশি দেরি হয়নি এখনো।

সংগে সংগেই আমি রাজি হয়ে গেলাম। লিণ্ডোয়াল আরো জানালেন যে, যে সমস্ত অঞ্চলের গাছের পাতা ঝরে গেছে, সেই সমস্ত অঞ্চলেই আকাশে অনভ্যস্ত প্লেনের আনাগোনা লক্ষ করা গেছে। যেহেতু ঐ সমস্ত কৃষিপ্রধান অঞ্চল অথবা অরণ্যের ওপরে ঘূর্ণায়মান প্লেন বেশি দেখা যায় না, সেই কারণেই ঘটনাটি স্থানীয় লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

—তার মানে প্লেনে করে এসে কিছু ছড়ান হয়েছে?

—ঠিক তাই। এবার তুমি মঁসিয়ে ব্রুনেভের চিঠিটা পড়।

প্রিয় লিণ্ডোয়াল,

তোমার চিঠি পাবার আগেই আমি খোঁজ খবর নিতে শুরু করি। প্রথমেই বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানায় নতুন কোন রাসায়নিকের বিরাট কোন অর্ডার হয়েছে কিনা জানবার চেষ্টা করি। ডু পন্ট কোম্পানিতে ক্যালসিয়াম ক্লোরেট রাসায়নিকটি কোন একটি সংস্থা প্রচুর পরিমাণে কিনতে চায়। ডু পন্ট রাজি হয়নি। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদকদের কাছে খবর নিয়ে জানলাম যে তারাও বিপুল পরিমাণে ঐ রাসায়নিকটি সরবরাহ করার জন্য অর্ডার পায়। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবের জন্য তারা কেউ সেই অর্ডার গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি।

এর পরের ঘটনাটি আরো চমকপ্রদ। "ইউরোপ সেভার" নামে একটি নতুন রাসায়নিক কোম্পানি সম্প্রতি ফ্রান্সের একটি অপেক্ষাকৃত জনবিরল স্থানে স্থাপিত হয়েছে। আমার অনুমান সেই কারখানায় একটি মাত্র রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করা হয় এবং তা হল ক্যালসিয়াম ক্লোরেট।

এবারে এই রাসায়নিকটির ব্যবহারের দিকটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আগে তুলো সংগ্রহটা একটা বিরক্তিকর পরিশ্রমের কাজ ছিল। এখন সেই কাজটি খুব সহজ হয়ে গেছে এই জাতীয় রাসায়নিকের ব্যবহারের ফলে। তুলো পেকে গেলে এই বস্তুটি গাছের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে কয়েকদিনের মধ্যে পাতা ঝরে যায়। তুলো সংগ্রহের কাজটা তখন খুব সহজ হয়ে যায়।

এই রাসায়নিকটির কিন্তু এতো চাহিদা থাকার কথা নয়। কারণ বর্তমানে পাতা ঝরানোর জন্য আরেকটি বিকল্প রাসায়নিক পাওয়া যায় যার নাম ক্যালসিয়াম সায়ানা সাইড। এটি জমিতে সারেরও কাজ করে—একটা বাড়তি লাভ। আমার সন্দেহ হচ্ছে কোন অশুভ কাজের জন্যই ক্যালসিয়াম ক্লোরেটটি এখন প্রস্তুত করা হচ্ছে।

তোমার
ব্রুনেভ

চিঠি পড়া শেষ করে আমি প্রফেসারের দিকে তাকালাম।

—তুমি ফ্রান্সে গিয়ে মঁসিয়ে ব্রুনেভের সঙ্গে দেখা করো। তারপর ব্যবস্থা করো প্রয়োজন মতো। তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো।

ফ্রান্সে গিয়ে ব্রুনেভের সঙ্গে দেখা করে ইউরোপ সেভারের কারখানাটি খুঁজে বার করতে বিশেষ সময় লাগল না। কিন্তু শত চেষ্টা করেও আমি কারখানাটিতে প্রবেশ করতে পারলাম না। কে তার মালিক তা-ও জানা গেল না।

এদিকে রোজই একটা না একটা উষ্ণ অঞ্চলের গাছের পাতা ঝরার খবর আসতে লাগল। এ রকম যদি চলতে থাকে তবে বিশ্বের আবহাওয়া বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

আমার মাথায় তখন আইডিয়াটা এলো। কিন্তু যত সহজ ভেবেছিলাম তত সহজে নিকোলাসকে পাওয়া গেল না। ওর মত ব্যস্ত মানুষ নাকি ফ্রান্সে বিরল। শুধু একটা চিঠি পেলাম নিকোলাসের কাছ থেকে তাতে সে যত শীঘ্র সম্ভব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে এ রকম আশ্বাস দিয়ে, যথোচিত আতিথেয়তা আমাকে দেখাতে পারছে না বলে দুঃখ জানিয়ে আর দিমিত্রভকে অনতিবিলম্বে বিশ্বের আদালতে খাঁড়া করানো উচিৎ এ রকম অভিমত ব্যক্ত করে দায় সারা গোছের কাজ সেরেছে।

শেষ পর্যন্ত পুলিশের বড়কর্তার সাহায্যে ঐ কারখানাটিকে ঘিরে ফেলা ছাড়া আমাদের কিছু করার ছিল না।

* * *

—কারখানার ভেতর কি দেখলে অনুকূল? দিদি চোখের পলক ফেলে।

—বস্তা বস্তা ক্যালসিয়াম ক্লোরেট, জনা চার পাঁচ কর্মী, দুটো ছোট্ট এরোপ্লেন আর····

অনুকূল জল খায়। ধীরে ধীরে গ্লাসের সমস্ত জলটা যথাস্থানে চালান করে দিয়ে সে গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখে।

—আর সেই বদমাইশটা, ক্রিস্টোফার নিকোলাস। ওর পরিকল্পনাটি ছিল চমৎকার। পুরো আফ্রিকার জংগল ও বারবার নষ্ট করে দেবে। ক্রমাগত ঐ রাসায়নিকটি প্রয়োগের ফলে গাছের পাতা আর গজাবে না। পাতা না থাকলে গাছও কিছুদিন পরে মরে যাবে আফ্রিকা হয়ে যাবে শুকনো।

হয়ত কোন হিসেব কষে নিকোলাস দেখেছে যে এর ফলে ইউরোপ হয়ে উঠবে শস্য শ্যামলা। কিন্তু বাঁদরটা মোটেই ভাবেনি যে এভাবে পৃথিবীর জল হাওয়ার পরিবর্তন ঘটালে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব। গোটা পৃথিবীটাই ধ্বংস ত্বরান্বিত হতে পারে এর ফলে।

—তাহলে তোমার আড়াই লক্ষ আমগাছের চারার কি হবে অনুকূল?

দিদি নাছোড়বান্দা।

অনুকূল গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না দিদির খোঁচা।

ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয়
পুরস্কার প্রাপ্ত

অমরনাথ রায়ের
সায়েন্স
এক্সপেরিমেন্টস

50টি বিজ্ঞানের মজার মজার এক্সপেরিমেন্টস—যা হাতে কলমে নিজেরাই পরীক্ষা করতে পারবে। দাম 10 টাকা। বই মেলায় প্রকাশিত হবে। স্টল নং 510

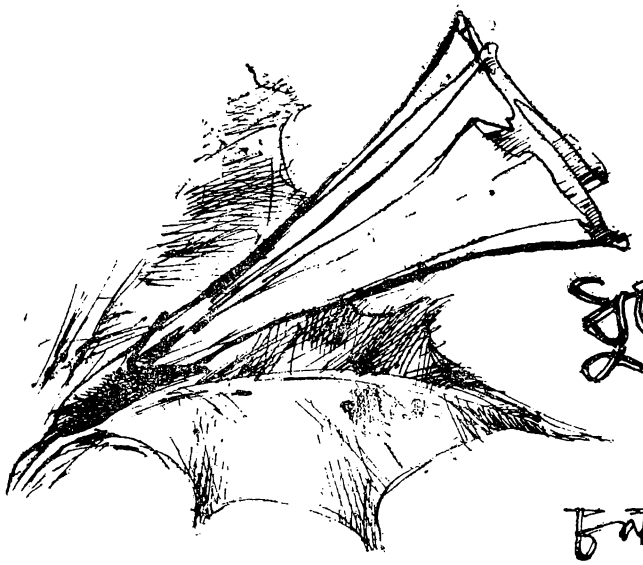

ধুতুরা গাছের গুনাগুন

চন্দন কুমার দাস

ধুতুরা গাছ নামটার সঙ্গে প্রায় সকলেই পরিচিত। যদিও শহরের লোকেরা হয়ত ধুতুরা গাছ চেনে না, অনেকেই হয়ত আবার এ নামটিই শোনেনি। কিন্তু পল্লীগ্রামে ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবাই চেনে। ধুতুরা গাছ সাধারণত 2 ফুট থেকে 4 ফুটের মত উঁচু হয়। ধুতুরা ফুল দুরকম—সাদা ও হলদে। আমাদের দেশে সাধারণত হলদে ফুলওয়ালা ধুতুরা গাছ খুবই কম জন্মে। সেই তুলনায় সাদাফুলওয়ালা ধুতুরা গাছ আমরা অধিক পরিমাণে দেখতে পাই। ধুতুরা ফুল ফানেলের মত দেখতে। এক মাথা সরু নলের মত এবং অপর মাথা চ্যাপ্টা হয়। পাতাগুলি লম্বা, পাতার কিনারা খাঁজ বিশিষ্ট। ধুতুরা ফল গোল হয়। এক একটি ফলের ওজন 150 গ্রাম থেকে 200 গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। ফলগুলির গায়ে অসংখ্য কাঁটা দেখা যায়। ফলটি পেকে গেলে—ফেটে বীজগুলি বেরিয়ে যায়।

ধুতুরা গাছের ইংরেজী নাম—ডেভিলাস ট্রামপেট বা এর বৈজ্ঞানিক নাম আবার দুটি। যথা—Devilas trampate (i) ডেটুরা ফ্যাস্টুয়েসা-বা Datura Fastuosa (ii) ডটুরা স্ট্রামোনিয়াম বা Datura Stramonium এই ধরনের গাছ সোলন্যাসিবা বার্তাকু বা Coelnasiva Bartacu গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

এগাছ যেখানে সেখানে—যত্নে অযত্নেই জন্মে। পল্লীগ্রামে যে সকল স্থানে গোবর জড়ো করা থাকে—তার পাশে এইগাছ বেশী জন্মে। তাছাড়া অন্য জোড়ালো মাটিতেও এই গাছ জন্মে। এই গাছের কাণ্ড খুব ছোট হয়।

ধুতুরা ফুলের গন্ধ না থাকলেও ইহা আমাদের অনেক কাজে লাগে। নীচে বর্ণনা করা হল। (1) কারও যদি খুবই সর্দি লাগে এবং সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে—অথবা নিঃশ্বাস ফেলতে যদি অসুবিধা হয়, তাহলে ধুতুরা ফলকে শুকিয়ে ইহা হুঁকোয় ভরে ধূমপান করলে আরাম পাওয়া যায়।

(2) কোন কারণে যদি শরীরের কোন জায়গা ফুলে যায় বা পড়ে গিয়ে ব্যথা করে—তাহলে ধুতুরা পাতার রস বার করে ঐ স্থানে প্রলেপ করলে বেদনা কমে যায়।

(3) কারো যদি দাঁতের গোঁড়া বা কানের গোঁড়া ফুলে গিয়ে বেদনা করে, তাহলে চার ভাগ ধুতুরা পাতার রসের সঙ্গে এক ভাগ আফিং মিশিয়ে লাগালে বেদনা কমে।

(4) কারো যদি ফোঁড়া হয় এবং দীর্ঘদিন ভাল না হয়। তাহলে সাত ভাগ ধুতুরা পাতার রসের সঙ্গে এক ভাগ ঘি মিশিয়ে ফোঁড়ায় লাগালে ফোঁড়া তাড়াতাড়ি পেকে যায় এবং ফেটে যায়।

(5) কোন বাচ্চার বা বড় মানুষের পেটে যদি অত্যন্ত কৃমি থাকে তাহলে ½ টা বা 2টা (বাচ্চাদের জন্য) এবং 2টি বা 4টি (বড়দের জন্য) ধুতুরা পাতার রস ঘোল-এর সহিত মিশিয়ে খাওয়ালে কৃমি নষ্ট হয়ে যায়।

(6) কারো যদি খাবার হজম না হয় অর্থাৎ বদহজম হয়—তাহলে ½ টা থেকে (বাচ্চাদের জন্য) বা 1টা থেকে 2টা (বড়দের জন্য) ধুতুরা ফলের বীজকে শুকিয়ে গুঁড়ো করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে খাওয়ালে হজম হয়।

উপরে লিখিত ছটি উপকারই ধুতুরা গাছের দ্বারা হয়। কিন্তু আগেই বলেছি ধুতুরা গাছ বিষাক্ত কাজেই ব্যবহার করবার আগে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাত্রা অধিক না হয়।

আমরা ভারতবাসী

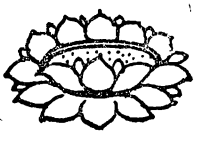

আমাদের আদর্শ হল

গণতন্ত্র

সমাজবাদ

ধর্মনিরপেক্ষতা

ন্যায়বিচার

স্বাধীনতা

সাম্য

সৌভ্রাতৃত্ব

সম্প্রীতি

একতা

অখণ্ডতা

শান্তি

প্রগতি

আমাদের সাধারণতন্ত্রী দেশে এগুলি
বাস্তবায়িত আদর্শ।

**চিরদিন এই আদর্শ সমূহের
জন্যই আমরা কাজ করব।**

davp86/404

ইউক্লিড

হিরন্ময় রায়

মানব সভ্যতার আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত যাঁদের প্রতিভা ও পরিশ্রমে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে নানান রত্নে, গ্রীক মহামনীষী ও অসাধারণ প্রতিভাধর গণিতবিদ ইউক্লিড তাঁদের-ই একজন। বিশ্বের ভাব ও জ্ঞান-রাজ্যে প্রাচীন গ্রীসের এক শ্রেষ্ঠ দান ইউক্লিড। ইউক্লিডের কথা উঠলেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় গণিতশাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট শাখা জ্যামিতির কথা, আর জ্যামিতির কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যাঁর নাম প্রথমেই আমাদের মনে জাগে তিনি ইউক্লিড। অর্থাৎ জ্যামিতি এবং ইউক্লিড—এই দু'টি নাম বা দু'টি শব্দই আজ একাত্ম, এক-ই সূত্রে গ্রথিত। তাদের একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা বা বিচার করা কোনো মতে-ই সম্ভব নয়।

জ্যামিতির সঙ্গে ইউক্লিডের নাম যে এমন অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িয়ে গেছে তার কারণ কিন্তু এই নয় যে ইউক্লিডের হাতেই জ্যামিতির গোড়াপত্তন ঘটে। ইউক্লিডের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই পৃথিবীর নানা দেশেই চলে আসছিল জ্যামিতির চর্চা। কোন কোন দেশ তো—যেমন ভারতবর্ষ—সেই সুদূর অতীতেই জ্যামিতির চর্চায় বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। প্রাচীন মিশর-ও এ-বিষয়ে পিছিয়ে ছিল না। আর, ইউক্লিডের নিজের দেশ গ্রীসে তো তাঁর (ইউক্লিডের) জন্মের বহু পূর্বে-ই থ্যালাস, পিথাগোরাস প্রভৃতির মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরা জ্যামিতির চর্চায় উৎসর্গ করে গিয়েছেন তাঁদের জীবন। তাহলে ইউক্লিডের কৃতিত্বটা কোথায়? তাঁর কৃতিত্বটা এইখানে-ই যে, তিনি আপন প্রতিভা ও সাধনায় জ্যামিতিকে দান করেছিলেন সম্পূর্ণ নূতন রূপ, করে তুলে-ছিলেন সম্পূর্ণ যুগোপযোগী। তাই জ্যামিতির সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয় তাঁর নাম।

আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউক্লিড জন্ম-গ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি গ্রীসের শ্রেষ্ঠ নগরী এথেন্সেই বসবাস করতেন এবং সেখানকার বিদ্যালয়েই তিনি শিক্ষালাভ করেন। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের গোড়ার দিকেও কিছুকাল তিনি জীবিত ছিলেন।

পরবর্তীকালে ইউক্লিডের কর্মক্ষেত্র ও বাসস্থান দুই-ই এথেন্স তথা গ্রীস থেকে স্থানান্তরিত হয় আলেকজান্দ্রিয়ায়। আলেকজান্দ্রিয়া মিশরের উত্তরাংশে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত ও গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রীক বন্দর নগরী। এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রীক বন্দর নগরীটি খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষদিকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার একটি কেন্দ্র হিসাবেও বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ম্যাসিডন অধিপতি আলেজাণ্ডারের বিখ্যাত সেনাপতি টলেমি তখন এখানকার সম্রাট। তাঁরই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অন্যান্য বহু গ্রীক পণ্ডিতের সঙ্গে ইউক্লিডও জন্মভূমি গ্রীস ত্যাগ করে চলে আসেন আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়েই শুরু করেন অধ্যাপনা।

আলেকজান্দ্রিয়াকে শিক্ষা ও জ্ঞান-চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে—এই ছিল আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট হিসাবে টলেমির প্রতিজ্ঞা। তাই শুধু গ্রীস থেকেই নয়, অন্যান্য আরও বহু দেশ থেকেও তিনি বহু জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে আসেন আমন্ত্রণ করে। অচিরেই আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্বের বিভিন্ন মনীষীর মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়ে ওঠে, আর শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবেও লাভ করে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন এবং এ বিষয়ে গ্রীসের গৌরব আর খ্যাতিও ম্লান হয়ে যায় তার কাছে। আর, এইভাবেই পূর্ণ হয় টলেমির প্রতিজ্ঞা।

এদিকে এই আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালেই ইউক্লিডের জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় অধ্যায়টি আসে। এই সময়েই তিনি 'এলিমেণ্টস অফ জিওমিট্রি' (Elements of Geometry) নামে তেরটি খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁর জ্যামিতি বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থখানিই তাঁকে এনে দেয় বিশ্বখ্যাতি। তাঁর নাম ব্যাপ্ত হয় চতুর্দিকে। একখানি অতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থের লেখক হিসাবে তিনি আদৃত হন বিদ্বৎসমাজে।

কিন্তু ইউক্লিডের এই বিখ্যাত গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্যগুলি কী? না, (1) ইউক্লিড তাঁর এইগ্রন্থে তাঁর পূর্ববর্তী গণিতা-চার্যদের জ্যামিতি সংক্রান্ত গবেষণাগুলির ফলাফল যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন, তেমনিই তাঁর নিজের জ্যামিতি সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা ও সেই সমস্ত গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তগুলিকেও তুলে ধরেছেন; (2) উপপাদ্যগুলিকে বিষয়ের গুরুত্ব বিচার করে পারম্পর্য অনুসারে সাজিয়ে দিয়েছেন যথাযথভাবে; এবং (3) সম্ভাব্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন বিকল্প প্রমাণ উদ্ভাবন করে সংযুক্তও করে দিয়েছেন। এবং এইভাবে তিনি যে কেবল জ্যামিতিকেই নবরূপ দান করেছেন তাই নয়, উপপাদ্য-গুলিকে বিষয় অনুসারে সুসংবদ্ধ প্রণালীতে সাজিয়ে দিয়ে আমাদের জ্যামিতি শিক্ষার পথও করে দিয়েছেন সুগম।

তা সে যাইই হোক, ইউক্লিডের জীবিতকালেই তাঁর এই বই শিক্ষিত সমাজে লাভ করে বিপুল সমাদর। শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন, এমন বহু মানুষও আকৃষ্ট হন বই-

খানির প্রতি। এমনকি স্বয়ং আলেকজান্দ্রিয়াধিপতি টলেমিও বইখানি সম্পর্কে উৎসুক হয়ে ওঠেন।....

এটা গল্প নয়, সত্যি কথা-ই।

ইউক্লিডের নীরস জ্যামিতি বিষয়ক বইখানি সম্রাট টলেমির মনেও জাগিয়ে তুললো আগ্রহ। ইলক্লিডের অনুরাগী তো তিনি গোড়া থেকেই ছিলেন। এরপর নানা লোকের মুখে বইখানির সুখ্যাতি শুনে তিনি ওই বইখানিরও অনুরাগী হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে জাগলো জ্যামিতি শেখার ইচ্ছা। হলেন তিনি ইউক্লিডের ছাত্র, তারপর নিয়মিতভাবে ইউক্লিডের কাছে পড়তে লাগলেন জ্যামিতি। খাটতে লাগলেন প্রচুর ; চেষ্টা করতে লাগলেন প্রাণপণে যাতে বিষয়টা তাড়াতাড়ি বুঝে নিয়ে নিজেকে ভালো ছাত্র বলে প্রতিপন্ন করতে পারেন। কিন্তু, কপালটাই বুঝি তাঁর খারাপ ; তাই সব চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ হলো। উৎসাহে কিঞ্চিৎ ভাটা পড়ে এলে একদিন তিনি নিজেই উপলব্ধি করলেন যে এতোদিনের এতো খাটুনি ও চেষ্টা সত্ত্বেও জ্যামিতির বিন্দু বিসর্গও তাঁর মগজে ঢোকেনি, আর ঢুকবেও না। আসলে বিষয়টাই কেমন গোলমেলে, মাথামুণ্ডু কিছু বোঝারই উপায় নেই। তবে বিষয়টা শেখার অন্য কোনো উপায় যদি থাকে—একদম সরল সহজ কোনো উপায়—তা হলে মাথায় ঢুকলেও ঢুকতে পারে জিনিসটা। আর, সে উপায় থাকবেই বা না কেন? থাকতেও তো পারে?

আশান্বিত হয়েমুখ তুলে টলেমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, জ্যামিতি শেখার অন্য কোনো পথ নেই? একদম সরল সহজ কোনো পথ?

হঠাৎ এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে গুরু ইউক্লিড ভারি আশ্চর্য হয়ে তাঁর সম্রাট ছাত্রের মুখের দিকে তাকালেন। এবং তাকিয়েই রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। বুঝি বুঝে নিতে চাইলেন তাঁর (টলেমির) মনের ভাবখানা। তারপর মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'না' সম্রাটদের শিক্ষালাভের জন্য আলাদা কোনো পথ নেই। কী সম্রাট, আর কি সাধারণ মানুষ—সকলের জন্যেই এ ব্যাপারে রয়েছে একটাই পথ। সেই পথে চলার মূল মন্ত্রই হলো অকৃত্রিম অনুরাগ, অটুট ধৈর্য আর কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা ও মানসিকতা। এগুলো যাঁদের নেই তাঁদের এ ব্যাপারে এগিয়ে না আসাই ভালো। বলে তিনি থামলেন। টলেমির মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে তাকালেন অন্যদিকে।

আর টলেমি? টলেমিও যা বোঝার ঠিকই বুঝলেন। সম্রাট হয়েও আচার্যের অমন কঠোর তিরস্কার বাক্যও হজম করে নিয়ে তিনি মানীর মান রক্ষা করলেন। তারপর সেখানেই জ্যামিতি পড়া ইতি করে সম্রাটের যা কাজ—সাম্রাজ্য শাসন—তাতেই আবার নিজের মন পুরোপুরি সঁপে দিলেন।....

তারপর কেটে গেল কতশতো যুগ। কালের কবলে সম্রাট টলেমি করলেন গতিলাভ। তাঁর সাম্রাজ্যও তাঁরই পথ একদিন করলো অনুসরণ। তারপর তারও চেয়ে কতো বৃহৎ আর মহৎ সাম্রাজ্যের হলো উত্থান আর পতন। কতো মহৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতির হলো জন্ম আর মৃত্যু। মানুষের ইতিহাস প্রাচীন আর মধ্যযুগ পার হয়ে পা দিলো আধুনিক যুগের আঙিনায়। তারপর সেই আধুনিক যুগও আজ বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে পা রাখতে চললো একবিংশ শতাব্দীর বুকে। ....কতো কিছু ওলোট পালোট হলো এই পৃথিবীর। ভেঙে চুরে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কতো কিছু মহাকালের বিশাল জঠরে তারা করলো স্থান লাভ। কিন্তু কতোদিন আগে গড়া ইউক্লিডের সেই জ্যামিতির সাম্রাজ্য কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আজও রয়েছে অটুট। আর সেই সাম্রাজ্যের মুকুটহীন সম্রাট হিসাবে ইউক্লিডই আজও রয়েছেন সবার শ্রদ্ধাভাজন হয়ে।

জ্যামিতির জগতে ইউক্লিড আজও রাজাধিরাজ! তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।

9/12, ঝিল রোড, এস্টেট কোয়ার্টার্স, কলকাতা—700002

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

সমরজিৎ করের

পরমাণু গবেষণায় ভারত ১৫·০০

জয়ন্ত বসুর

পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময় ১৫·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ : 86/1, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭

দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস

বাণীরূপ-অনিল কর্মকার
চিত্ররূপ-গৌতম কর্মকার

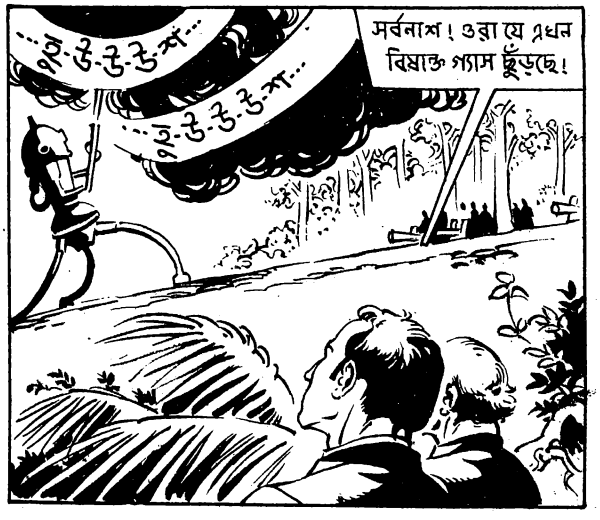

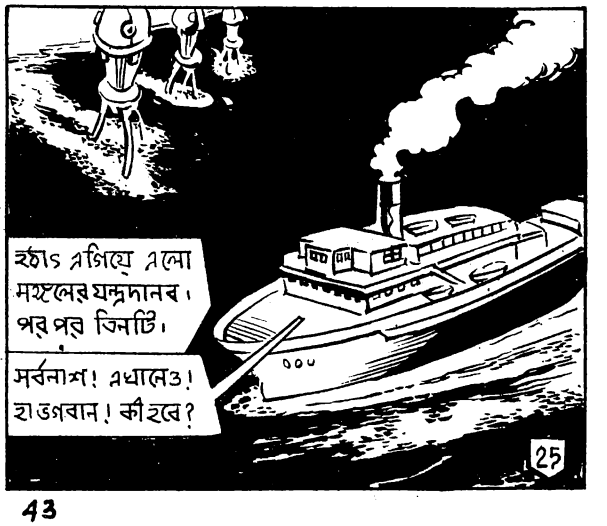

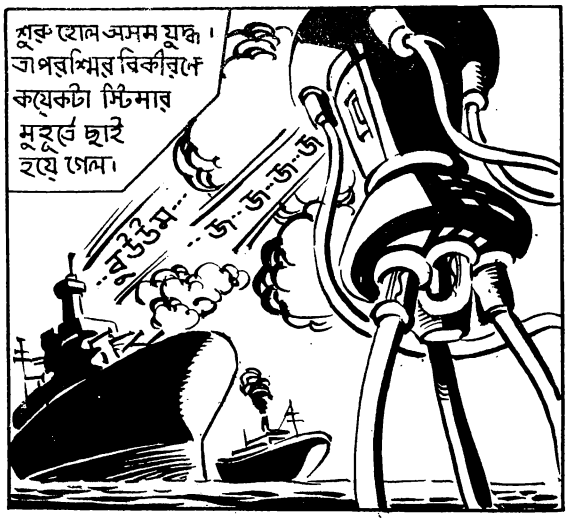

..বুম..বুম..বুম...
এবার গর্জন করে উঠলো থান্ডার চাইল্ড। চার পাশ ভীষণভাবে কেঁপে উঠলো।
শুরু হোল অসম যুদ্ধ। তাপরশ্মির বিকীরণে কয়েকটা স্টিমার মুহূর্তে ছাই হয়ে গেল।
..বুউউম...
..ড..ড..ড..ড
থান্ডার চাইল্ড কিন্তু দমলো না।
...আনমুউউ...
..বুউউম..বুউউম...
পড়েছে..পড়েছে.. একটা ডুবছে.. ঐ আর একটাও...
ডুবন্ত দানবদুটোর ভিতর থেকে তারপর কী ভয়ঙ্কর একটা আর্তনাদ..
বাঁচবার জন্যে আমি আর পাদ্রী তখনো ছুটছি তো শুধু ছুটছিই...
উঃ, আর কতোক্ষন এভাবে চলবে?
যতোক্ষন দরকার। না, আর বোধহয় নয়.. ঐ বাড়ীটা..চলুন, ঐ খানেই আমরা আশ্রয় নিই।
মনে হয়-মঙ্গলবাসীরা এখান থেকে পালিয়েছে। আমি এখন আমার স্ত্রী আর ভাইয়ের খোঁজে যাবো।
26

হঠাৎ দূরে একটা শব্দ শোনা গেল--
ঝম-ঝম-ঝম--
সর্বনাশ, একটা যন্ত্রদানব যে এই দিকেই আসছে! পালাও-- পালাও--
মানুষজন ছুটে পালাচ্ছিল। যন্ত্র-দানবটি তার শুঁড় দিয়ে এক-এক জনকে ধরছিল, আর তার সিলিন্ডারের মধ্যে ভরে নিচ্ছিল।
আঁআঁ--
বাঁচাও--
আশ্চর্য! এ কী ব্যাপার? এমনভাবে মানুষ-গুলোকে বন্দী করার কী উদ্দেশ্য?
সামনেই একটা মৃতদেহ দেখে চমকে উঠলাম।
দেহে এতোটুকু রক্ত নেই। মঙ্গলবাসীরা ওর সবরক্ত শুষে নিয়েছে। মানুষের রক্তই ওদের খাদ্য। তারই জন্যে বলবান মানুষগুলোকে ওরা ধরে-ধরে সিলিন্ডারে পুরছে।
গভীর রাত। আমরা তখন বাড়ীটার মধ্যে।
গোঁওওও--
হুঁ--আর একটা সিলিন্ডার। মঙ্গলগ্রহের পঞ্চম সিলিন্ডারটি পৃথিবীতে পৌঁছলো।
মঙ্গলবাসীরা খুব কাছাকাছিই এবার নেমেছে। এখন এই বাড়ীটাই আমাদের ভরসা।
27

না না, এভাবে বেঁচে থাকা যায় না। আমরা কি চোর, না খুনী?
চুপ করুন, চুপ করুন… ওরা শুনতে পেয়ে যাবে।
না, আমি থামবো না।
পাদ্রীসাহেব হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠলেন।
আমরা পাপ করেছি, তাই এই শাস্তি। দারিদ্র দুঃখ দূর করবার চেষ্টা না করে আমরা গরীবদের শুধু শান্তির কথা, ভালোবাসার কথা শুনিয়েছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছুই করিনি।
চুপ করবেন, না কি…
রাগে অন্ধ হয়ে আমি একটা কুড়ুল তুলে সামনে আগালাম।
ঠকাস…
আঁইইই…
পাদ্রীসাহেব অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। কিন্তু…
সর্বনাশ! শুনতে পেয়েছে ওরা। দেয়ালের ফাটল ভেদ করে একটা শুঁড় ভিতরে ঢুকছে।
খোঁজ করছে আমাদের। কী করি-- কী করি ?
শুঁকে শুঁকে দেখছে-- আর একটু পরেই আমাকে ধরবে।
যথাসম্ভব আড়াল খুঁজে আমি লুকোলাম।
28

(22 পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সায়ানটিস্ট হব। আকাশের তারার দিকে তাকালে ছাত্র-জীবনের সেই ইচ্ছের কথাটা মনে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হলাম পিক-পকেট অফিসার আই-টি-ও। তবে কি জানেন, আমাদের দুটো জীবন আছে। একটা বাইরের আর একটা ভেতরের। মাঝে-মাঝে রাতের পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকালে সেই ভেতরের জীবনটা সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। কী বিশাল এই ইউনিভার্স, কী ব্যাপক এই সৌর-জগৎ! কত তারা, কত নক্ষত্র, গ্রহ। বুঝলেন, ভারি আশ্চর্য লাগে। ভাবতে ভাবতে আমার প্রফেশনাল লাইফের কথা ভুলে যাই।'

এখানে, পাহাড়ের এই শীর্ষ থেকে মনে হয় আকাশ অনেক কাছে। আকাশের ঝকঝকে তারাগুলো যেন খুব বেশি দূরে নয়। সেই দিকে তাকিয়ে থেকে আমিও বহুদূর-মনস্ক হয়ে গেলাম। বললাম, 'সত্যিই ভারি অবাক লাগে। কী বিশাল ব্যাপার। এত কাছে মনে হচ্ছে, অথচ লক্ষ-লক্ষ মাইল দূরে লক্ষ-লক্ষ নক্ষত্র আছে।'

'শুধু লক্ষ-লক্ষ মাইল নয়, লক্ষ-লক্ষ লাইট-ইয়ার দূরে। আলোকবর্ষ কী নিশ্চয় জানেন? প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশ একাত্তর মাইল হল আলোর গতিবেগ। তা হলে বুঝুন এক বছরে আলোর গতিবেগ কত দূর। তার মানে ষাট সেকেণ্ড ইনটু চব্বিশ ঘণ্টা, ইনটু তিনশ পঁয়ষট্টি, ইনটু এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশ একাত্তর। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যে নক্ষত্র আছে তার আলোই পৃথিবীতে আসতে লাগে চার বছর।'

খুব কৌতূহল হল মিস্টার শর্মার কথায়। বললাম, 'খুব ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার কিন্তু।'

শর্মা বললেন 'এমনও নক্ষত্র আছে যার আলো আজও পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় নি; পৃথিবীর বয়েস কত, জানেন?

জানতাম। বললাম, পাঁচশ কোটির কিছু কম।'

'চারশ আশি কোটি। তা হলে হিসেব করুন, পৃথিবী থেকে সেই তারার দূরত্ব কত!'

বললাম, 'অসম্ভব কাগজ কলমে কুলাবে না।'

শর্মা একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, 'আলোর গতিবেগই, সবচেয়ে দ্রুতশীল, বিজ্ঞান অবশ্য এই কথাই বলে।'

বললাম, 'কেন, আলোর চেয়ে গতিশীল কিছু আছে কি?

'আছে।'

'আছে? কী বলুন তো?'

শর্মা হাসলেন 'কথাটা কিন্তু অবৈজ্ঞানিকের মত শোনাবে এবং অপ্রাসঙ্গিকও হয়ে যাবে।'

আমিও হাসলাম। বললাম, 'আমরা তো কোনো সায়ান্স কনফারেন্সে লেকচার দিচ্ছি না। ক্যাজুয়াল গল্প করছি। বলুন না, আলোর চেয়ে গতিসম্পন্ন জিনিসটা কী?'

'মানুষের মন।' বলেই শর্মা আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'টেলিপ্যাথি সম্বন্ধে কিছু জানেন?'

প্রকাশ পাণ্ডের গল্পটা তখনই শুনলাম। আকাশের তারা থেকে আলোর গতি, আলোর গতি থেকে মানুষের মন, মানুষের মন থেকে টেলিপ্যাথি—আর টেলিপ্যাথির কথা বলতেই প্রকাশ পাণ্ডে এসে গেলেন। আসলে প্রথম থেকেই ধাপে ধাপে একটা গল্পের আয়োজন তৈরি হচ্ছিল, টেলি-প্যাথিতে এসে সেই আয়োজন সম্পূর্ণ হল। সামসিং ফরেস্ট-বাংলোর লনে সেই শান্ত, শীতল সন্ধ্যায় হেলানো বেতের চেয়ারে বসে মিস্টার বিজয় শর্মা যখন গল্পটি শুরু করলেন, তখন চারদিকে পার্বত্য রাত্রির থমথমে অন্ধকার নেমে এসেছে।

"মানুষের শরীরের যে জিনিসটার অস্তিত্ব আমরা সবচেয়ে বেশি অনুভব করি তা হল মানুষের মন। এই মনের জন্যেই আমরা হাসি, কাঁদি, রাগ করি, অভিমান করি, দুঃখ পাই, ভালবাসি। এ সবই হল মনের এক-এক রকম প্রকাশ। অথচ এই মন কি উপাদান দিয়ে তৈরি, শরীরের কোথায় আছে, আমরা জানি না। ডিসেকশন-রুমে একজন মানুষের শরীরে ছুরি চালিয়ে লাংস, হার্ট, কিড্‌নি, লিভার, স্টমাক—সব পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন জিনিসটা মন? শরীর তন্নতন্ন খুঁজে কারো মনকে পাওয়া যাবে না। অথচ মন বলে তো একটা জিনিস আছে। মনের তীব্র শক্তি আছে, স্পীড আছে, পাওয়ারফুল সেন্স আছে! মন আছে বলেই তো আমরা ভাবতে পারি, স্বপ্ন দেখি। তা হলে? পদার্থ বিজ্ঞানে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে ট্যাকিয়ান। ট্যাকিয়ান হচ্ছে এক নিরালম্ব ভারহীন কণিকাগুচ্ছ, যার গতিবেগ আলোর চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। তা হলে মন কি সহস্র-লক্ষ ট্যাকিয়ান দিয়ে তৈরি? ওয়েট নেই, সাপোর্ট নেই, দেখা যায় না, কিন্তু বোঝা যায়? তাই কি আমরা চোখের পলকে লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো ঘুরে আসি মনে মনে? কে জানে! আগামী দিনের বৈজ্ঞানিকরা হয়তো বলতে পারবেন।

আমি যে টেলিপ্যাথির কথা বলছি, তা হল মনের সেই তীব্র ফোর্সের রূপান্তরিত অবস্থা। জিনিসটাকে বোঝানোর জন্যে আমি আমার এক বন্ধুর গল্প বলছি। ডাক্তার প্রকাশ পাণ্ডে আমার অনেকদিনের বন্ধু। আমি যখন পাটনায় পোস্টেড ছিলাম, সেই সময় থেকে আমাদের হৃদ্যতা। পেশায় ডাক্তার, কিন্তু নেশা ছিল মনোবিদ্যার। মানুষের মন সম্বন্ধে নানান বই পড়তে পড়তে এবং নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলেন যে প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তির দ্বারা মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। প্ল্যানচেটের মিডিয়াম হচ্ছে এই ইচ্ছেশক্তির দাস, যদিও তার গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা তিনি পান নি। কিন্তু টেলি-প্যাথির সাহায্যে কোনো শব্দ কিংবা সংকেত ছাড়াই

বহুদূরের কোনো মানুষের সঙ্গে মানসিক-যোগাযোগ করা যায়, দূরকে নিকট করা যায়। মোট কথা এমন সব কাণ্ড করা যায়, যার বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

পাটনা থেকে বদলি হয়ে চলে যাবার পর বেশ কয়েক বছর পরে প্রকাশের সঙ্গে আবার যখন দেখা হল, তখন তাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারি নি। তাজা, জোয়ান লোকটা যেন কয়েক বছরেই অনেক বুড়ো হয়ে গেছে, শরীর-স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, মাথার চুল কমে গেছে। যেটা অদ্ভুত লাগল, সেটা হল ওর চোখ দুটো। যেখানে বুড়োটে ভাব নেই, বরং এক আশ্চর্য তীব্রতা রয়েছে।

বললাম, 'একি ডাক্তার তোমার এরকম হাল হয়েছে কেন?'

প্রকাশ বললেন, 'ও কিছু না। মনের ওপর প্রেসার পড়লে শরীর একটু বেহাল হবেই বন্ধু।'

বললাম, 'মনের আবার কি হল?'

প্রকাশ বললেন, টেলিপ্যাথির ওপর এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলাম। সফলও হয়েছি বলতে পার।'

প্রকাশের এই সব আগ্রহের কথা আমার জানা ছিল, তাই অবাক হলাম না। তবু ব্যাপারটা শোনবার জন্যে দিয়ে বললাম, 'কি রকম?'

'সে অনেক কথা। ইট্‌স্ এ লং স্টোরি। শুনবে?'

বললাম, 'বলো।'

প্রকাশ বললেন, 'তুমি তো জান মানুষের মন নিয়ে বরাবরই আমার কিছু চিন্তাভাবনা আছে। ইচ্ছে হল টেলিপ্যাথির ওপর পরীক্ষা চালাব। কেমন পরীক্ষা? মনকে একাগ্র করে কোনো কিছুকে জীবন্ত এবং নির্ভুল ভাবে চিন্তা করলে তা যতই দূরে থাকুক, যতই অসাধ্য হোক, কাছে আসবে—এই পরীক্ষা। এই একাগ্রতা বা কনসেন-ট্রেশন অব মাইণ্ড কি ধরনের? একটু হাতে কলমে বোঝা-নোর চেষ্টা করছি।' প্রকাশ তার টেবিলের ওপর থেকে পিন-কুশানটা তুলে নিয়ে বললেন, 'তুমি দেখতে পাচ্ছ এই কাপড়ের গোলাকার বস্তুটার চারদিকে অজস্র আলপিন লাগানো আছে। এবার তুমি এই ছড়ানো পিনগুলোর মধ্যে একটি মাত্র পিনের মাথা দেখবে। কেবল মাত্র একটি পিনের মাথা, অন্য কিছু একটুও নয়। কিংবা ধরো একটি গাছে অজস্র ছোট ছোট ফুল ফুটে আছে। তোমাকে গাছের দিকে তাকিয়ে শুধুমাত্র একটি ফুলকে দেখতে হবে। তোমার দেখার মধ্যে আর কিছু থাকবে না—অন্য কোনো ফুল নয়, গাছের পাতা নয়, ডাল নয়, অন্য কোনো পারিপার্শ্বিকতা নয়—শুধু একটি নির্দিষ্ট ফুল। যেন দৃশ্যের একটি মাত্র নির্দিষ্ট পয়েণ্ট ছাড়া অন্য সব কিছু রবার দিয়ে মুছে ভ্যানিস করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত দৃষ্টিকে চারপাশ থেকে কমিয়ে এনে সূচীমুখ করে শুধুমাত্র একটিমাত্র আলপিন কিংবা ফুল দেখার ক্ষমতা অর্জন করাই এই একাগ্রতা। বিবেকানন্দ কিংবা গান্ধীজির দশটা হাত কিংবা দশটা মাথা ছিল না, ছিল এই মানসিক ক্ষমতা, এই একাগ্রতা। এই একাগ্রতা নিয়ে কাউকে ভাবলে তার সঙ্গে তোমার মনের সংযোগ ঘটবেই। আমি ঠিক করলাম ব্যাপারটা নিয়ে পরীক্ষা করব।

সমস্তিপুরে আমি যখন ইস্কুলে পড়তাম, তখন জগদীশ চৌবে, ছিল আমার সহপাঠী। কলেজেও তাকে পেয়েছি। আমার মত তার মাথায়ও পোকা নড়াচড়া করত। টেলিপ্যাথি, প্ল্যানচেট, আত্মার অবিনশ্বরতা, এইসব নিয়ে ভাবাভাবি করত। বহুদিন তার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। আমি এই জগদীশের কথা ভাবতে লাগলাম। তার চোখ, মুখ, চুল, হাত-পা, কথা বলা, হাঁটা চলা সব কিছু অত্যন্ত স্পষ্ট আর নিখুঁতভাবে চোখের সামনে ভাসিয়ে রেখে তাকে চিন্তা করতে থাকলাম। স্টেজের নাটকে যেমন অন্য সব চরিত্রকে অন্ধকার করে দিয়ে কেবল একটি মাত্র চরিত্রের ওপর স্পটলাইট এসে পড়ে, তেমনিভাবে আমি জগদীশকে মনে মনে ভাবতে লাগলাম। তো একদিন গেল, তিনদিন গেল, দিনের পর দিন চলে গেল। কিছুই টের পেলাম না। তবে কি ব্যাপারটা মিথ্যে? না কি জগদীশ বেঁচে নেই বলে তার দেখা পাচ্ছি না, তার সঙ্গে মনের করতে পারছি না? কিংবা জগদীশ বেঁচে আছে ঠিকই, কিন্তু এই টেলিপ্যাথি ব্যাপারটাই একটা প্রচণ্ড ভাঁওতা, ভাবতে ভাবতে আমি পাগলের মত হয়ে গেলাম। আমার চেম্বার বন্ধ রইল, ডাক্তারি মাথায় উঠল। প্রসঙ্গত একটা জিনিস বলি। বেশ কিছুদিন ধরে অন্য ধরনের একটা অদ্ভুত জিনিস পাচ্ছিলাম। সব সময় মনে হত চুম্বকের মত কি আমাকে অবিরত টানছে। কি সেই জিনিস, কোথায় আমাকে টানছে, কেন আমাকে টানছে, কিছুই আমার জানা নেই। শুধু বুঝলাম দুনিবার সেই আকর্ষণ থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো উপায় আমার নেই। মেণ্টাল ব্যালান্স ঠিক রাখতে পারছিলাম না। আর ঠিক এই সময়েই এক চরম দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিলাম। আমার গৃহভৃত্যকে চোর সন্দেহ করে প্রচণ্ড রাগে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। আলমারি থেকে বন্দুক বের করে গুলি চালিয়ে দিলাম তার ওপর।

আমি চমকে উঠে বললাম, 'সে কি, খুন?

প্রকাশ বললেন, 'না, খুন নয়। গুলিটা সৌভাগ্যবশতঃ পায়েই চালিয়ে দিলাম, ডান পায়ের চামড়া কিছুটা জখম করে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ ছাড়ল না। অ্যাটেমট টু মার্ডার। লোকে ভাবল আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আসলে তখন এক অদৃশ্য শক্তির অমোঘ আকর্ষণ আমাকে চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে টানছিল। এদিকে জগদীশের চিন্তাও আমাকে অন্যসব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল। এই

আমি চমকে উঠলাম, "সেকি খুন ?"

দুয়ের যোগফলে আমার তখন অপ্রকৃতিস্থের অবস্থা। কি করলাম, কেন করলাম, নিজেই বুঝতে পারি নি। কোর্টে আমার কনভিকশন হল। তিন-মাসের জেল।'

বললাম, 'জেল খাটতে হল তোমার ?'

প্রকাশ বললেন, 'হয়। আর জেলখানায় গেলাম বলেই তো আসল ঘটনাটা ঘটল।'

আমি অধীর গলায় বললাম, 'কী ঘটল ?'

প্রকাশ বললেন, 'জেলখানায় আমাকে যেখানে রাখা হল, সেখানে আরও কয়েকজন কয়েদী ছিল। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম। অনেকদিন পরে দেখলেও চিনতে অসুবিধে হল না। একি, এ যে আমার সেই বন্ধু জগদীশ চৌবে, যার কথা এই সেদিনও আমি ভেবেছি! আমি দেখলাম জগদীশও অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। অস্ফুট গলায় বললাম, 'জগদীশ, তুমি ?'

জগদীশ বললেন, 'কপালের ফের। ব্যাঙ্ক ওভার-পেমেণ্ট দিয়ে ফেললাম এক লক্ষ টাকা—পড়ে গেলাম তছরূপের দায়ে।' আমি কাঁপা-কাঁপা গলায় বললাম, 'জগগীশ তুমি কবে এখানে এসেছো ?'

জগদীশ বলল, 'মাস চারেক হবে। প্রকাশ, একটা আশ্চর্যের ব্যাপার জানিস, আমি অনেকদিন ধরে তোর কথা ভাবছি। বলতে পারিস টেলিপ্যাথির মাধ্যমে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। কি আশ্চর্য, তুই এখানে চলে এলি! তবে কি আমার মনের শক্তিই তোকে এখানে নিয়ে এল ?

আমি আর কী বলব! চরম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জগদীশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।"

প্রকাশ পাণ্ডে তার গল্প শেষ করেছিলেন, বিজয় শর্মাও শেষ করলেন এখানে। সামসিং ফরেস্ট-বাংলোর লনে চারদিকের অথৈ অন্ধকারে গা ভিজিয়ে বসে থেকে আমিও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। গল্পটা অদ্ভুত সন্দেহ নেই, কিন্তু এর পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কি ?'

পড়াশোনা

একটি ক্ষারধর্মী গ্যাস

অমরনাথ রায় ও বিবেক রায়

জোসেফ প্রিস্টলী (1733—1804) নামে এক ইংরেজ রসায়নবিদ্ 1774 খ্রীস্টাব্দে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও চুণকে উত্তপ্ত করে একটি গ্যাস প্রস্তুত করেন এবং গ্যাসটির নাম দেন 'ক্ষারীয় বায়ু'। পরের বছর 'ক্লড লুই বার্থেলো' (1748—1822) নামে এক ফরাসী রসায়নবিদ্ প্রিস্টলী কর্তৃক আবিষ্কৃত 'ক্ষারীয় বায়ু'কে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে গ্যাসটি এক দ্বি-যৌগিক পদার্থ এবং নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন এর সমন্বয়ে গঠিত।—এই গ্যাসই 'অ্যামোনিয়া'।

পরীক্ষাগারে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (নিশাদল) এবং প্রায় শুকনো কলিচুণ অথবা পোড়াচুণের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করলেই অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন গ্যাসকে চুণস্তম্ভের মধ্যে দিয়ে পরিচালনা করে প্রথমে জলীয় বাষ্প মুক্ত করা হয়। তারপর শুষ্ক গ্যাসটিকে উপুড় করা একটি গ্যাসজারের মধ্যে বায়ুর নিষ্কাপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয়। এর থেকেই বোঝা যায় যে অ্যামোনিয়া গ্যাস বাতাসের চেয়ে হাল্কা।

গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড, ফসফরাস পেণ্টক্লাইড এবং অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি জলাকর্ষী যৌগগুলির কোনটির দ্বারাই অ্যামোনিয়া গ্যাসকে শুষ্ক করা যায় না, কারণ ঐ সব যৌগের প্রত্যেকটিই অ্যামোনিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়া করে যৌগ গঠন করে। কিন্তু চুণের সঙ্গে অ্যামোনিয়া বিক্রিয়া করে না বলে অ্যামোনিয়াকে শুষ্ক করবার জন্যে পোড়াচুণ ব্যবহার করা হয়।

অ্যামোনিয়া বর্ণহীন গ্যাস। এটি অত্যন্ত ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত গ্যাস বলে 'স্মেলিং সল্ট' প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। অ্যামোনিয়া গ্যাস জলে অত্যন্ত দ্রাব্য এবং এর জলীয় দ্রবণ ক্ষারধর্মী বলে এই গ্যাসটি নিয়ে 'ফোয়ারা পরীক্ষা' করা যায়। শৈত্য প্রয়োগে অ্যামোনিয়াকে কঠিন পদার্থে পরিণত করা যায়। অ্যামোনিয়ার গাঢ় জলীয় দ্রবণ 'লাইকার অ্যামোনিয়া' নামে পরিচিত। লাইকার অ্যামোনিয়ার উচ্চচাপে সংকুচিত অবস্থায় থাকে। কাজেই বোতলটিকে ঠাণ্ডা না করে হঠাৎ খুললে চাপ মুক্ত হয়ে কিছুটা অ্যামোনিয়া ছিট্‌কে বাইরে বেরিয়ে আসে। যদি তা ছিটকে চোখে পড়ে তাহলে দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

অ্যামোনিয়া গ্যাসকে সনাক্ত করার অনেক উপায় আছে। একটা সহজ উপায়ের কথা বলি। একটি কাচদণ্ড গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ডোবাও এবং তারপর সেটিকে অ্যামোনিয়া পূর্ণ গ্যাসজারের মুখের কাছে আন। অমনি সাদা ধোঁয়ার উৎপত্তি হবে। ঐ সাদা ধোঁয়া আসলে অতি সূক্ষ্ম ও কঠিন সাদা রঙের অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সমষ্টি। অ্যামোনিয়া গ্যাস দাহ্য নয়, দহনের সহায়কও নয়, তবুও এটি অক্সিজেন গ্যাসে সামান্য হলুদ রঙের শিখাসহ জ্বলে এবং এই জ্বলনের ফলে অ্যামোনিয়া জারিত হয়ে নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। অ্যামোনিয়ার সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে 'অ্যামোনিয়াম সালফেট' পাওয়া যায়। আবার অ্যামোনিয়ার সঙ্গে কার্বন-ডাই অক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে 'ইউরিয়া' পাওয়া যায়। অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং ইউরিয়া—উভয়েই জমির পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণকে বলা হয় অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড। এটি একটি মৃদুক্ষার। তাই এর সংস্পর্শে লাল লিটমাস দ্রবণ নীল হয়ে যায়। রসায়নাগারে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বিকারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বরফ তৈরির কারখানায় জলকে শীতল করার কাজে অ্যামোনিয়ার প্রয়োজন হয়। আরও অনেক ক্ষেত্রে শীতলী করণের কাজে অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হয়। ওষুধ হিসাবেও অ্যামোনিয়া এবং অ্যামোনিয়ার কোন কোন লবণ ব্যবহৃত হয়।

একটি কাচনলের মধ্যে ধাতব সোডিয়াম রেখে তাপ দিকে তাকে গলিয়ে কাচ-নলের মধ্যে দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস পরিচালনা করলে সোডামাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। ঐ গ্যাসকে সংগ্রহ করে তাতে একটি জ্বলন্ত শলাকা ধরলে গ্যাসটি নীল রঙের শিখা উৎপন্ন করে জ্বলে। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে অ্যামোনিয়ায় হাইড্রোজেন আছে। আবার অতিরিক্ত পরিমাণ অ্যামোনিয়ার সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়া ঘটালে নাইট্রোজেন গ্যাস পাওয়া যায়। এই গ্যাস সংগ্রহ করে তারমধ্যে একটি জ্বলন্ত শলাকা প্রবেশ করালে শলাকাটি নিভে যায়। তাছাড়া এই গ্যাস স্বচ্ছ চুণ-জলকে ঘোলাও করে না। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে অ্যামোনিয়ায় নাইট্রোজেন আছে।

অ্যামোনিয়া সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানার আছে। উঁচু ক্লাশে উঠলে সেগুলি বই পড়ে জেনে নিতে পারবে।

1987 মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

ভৌত বিজ্ঞানে বেশি নম্বর পেতে গেলে

অজয় চক্রবর্তী

কম পড়ে বেশি নম্বর কেমন করে পাওয়া যাবে সে-কৌশল সেখানোর জন্য লিখতে বসি নি। তেমন কোন কৌশল আছে বলেই আমার জানা নেই। নিয়মিত পড়াশুনো করা পরীক্ষায় ভাল করার প্রথম এবং প্রধান শর্ত। তবে একথাও ঠিক যে, কেবল বেশি পড়লেই নম্বর পাওয়া যায় না। পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেতে গেলে কয়েকটি বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। তোমরা যারা এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে তাদের কথা ভেবে এ এ ব্যাপারে কয়েকটা প্রয়োজনীয় নির্দেশ রাখছি। ছাত্র পড়ানোর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি যে, অনেক ছাত্রই পড়ুয়া, কিন্তু তারা সবাই পরীক্ষায় ভাল করে না। তারা যদি কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক হয় এবং সুশৃঙ্খলভাবে তাদের পঠিতব্য বিষয়ের নিয়মিত অনুশীলন করে তবে তারা অনেক ভাল ফল করতে পরে।

পঠিতব্য বিষয়গুলো ভালভাবে আয়ত্ত করলেই কিন্তু পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় না, কেননা তুমি কতোটা জানো পরীক্ষার হলে তার পরীক্ষা ততোটা হয় না, যতোটা হয় তুমি বিষয়গুলোকে লিখে কতোটা প্রকাশ করতে পারো তার। কাজেই, পড়া যতোটা জরুরী লেখার অভ্যাস ঠিক ততোটাই জরুরী। পরীক্ষার খাতায় অনাবশ্যক কথা আদৌ লেখা উচিত নয়। বিজ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর হবে ঋজু এবং প্রশ্নানুগ। নিউটনের 'মহাকর্ষ সূত্রের' বিবৃতি দিতে গিয়ে অনেকে পরীক্ষার খাতায় নিউটনের আপেল পড়তে দেখার গল্পও লিখে ফেলে। এতে হয়তো পরীক্ষক খাতা দেখতে বসে গল্পের মজা পারেন, কিন্তু তিনি এজন্য গল্পকারকে পুরস্কৃত করবেন না। বিষয়কে সুখপাঠ্য করে উপস্থাপনের দায়ে পাঠ্যবই-লিখিয়েরা নানান ভূমিকার অবতারণা করেন, পরীক্ষার খাতায় সে-সব বর্জনীয়। প্রশ্নে যা জানতে যাওয়া হয়েছে সরাসরি তার উত্তর দেওয়াই অভিপ্রেত। মনে রাখতে হবে যে, বাড়তি কথা বললে বাড়তি নম্বর হয় না। 'অধিকন্তু ন দোষায়' বলে একটা কথা চালু আছে। কথাটা যতোই চালু থাকে—তোমরা জেনে রাখো, পরীক্ষার খাতায় 'অধিকন্তু' পরীক্ষকের চোখে দোষণীয় এবং বর্জনীয়। অনেক ছাত্রই বিস্তর পড়ে, কিন্তু পরীক্ষার হলে বসে পরীক্ষায় লেখা ছাড়া আর কখনো প্রশ্নের উত্তর লেখে না। অভ্যেস ছাড়া কোন কিছুই ভাল-ভাবে করা যায় না। তাই, যারা আগে থেকে উত্তর লিখে প্রস্তুতি নেয় নি। জানা বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়েও তাদের নানান স্খলন ঘটে—তাতে নম্বর কমে যায়। পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে হলে বাড়িতে বসে প্রশ্নের উত্তর লেখা অভ্যেস করতে হবে এবং এর পর অভিজ্ঞ শিক্ষককে দিয়ে সে-সব উত্তর দেখিয়ে তাদের মতামত নিতে হবে। তোমরা যারা এখানো এভাবে শেখার অভ্যাসে করো নি তারা আজই শুরু করে দাও। শুরু করলেই দেখবে যে, জানা বিষয় সম্পর্কে শিখতে গিয়েও কতো ভুল করে বসছো। একবার শিখে ভুলগুলো শুধার নিয়ে দ্বিতীয়বার লিখে *দেখো। দেখবে, এবার আগের চেয়ে ভালো লেখা হয়েছে।* এভাবে বার বার লিখলে নিখুঁত উত্তর লেখার পটুতা জন্মাবে।

তোমরা অনেকেই একই বিষয়ে একাধিক লেখকের বই পড়ো। এটা খুবই ভালো অভ্যেস। এতে একই বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ মেলে। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা কথা মনে রাখা দরকার। বিভিন্ন বই পড়া ভালো, কিন্তু অন্তত একটা পাঠ্যবই আগাগোড়া পড়া অবশ্য কর্তব্য। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর মধ্যে একটা ধারা-বাহিকতা থাকে ;—সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার মতো ধাপে ধাপে বিষয়গুলোকে আয়ত্ত করতে হয়। এক একটা অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ এক একটা বই থেকে পড়লে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময় বিষয়গুলোর মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পায় না। কিন্তু একটি বই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর ঐক্য সূত্রটি সহজেই তাদের গোচরে আসে। এভাবে একটা বই ভালভাবে পড়ার পর পঠিতব্য বিষয়গুলোকে আরো বিশদভাবে বোঝার জন্য অন্যান্য বই পড়ার প্রয়োজন হয়। মাধ্যমিক স্তরে এমন কিছু খুঁটিনাটি প্রশ্ন আজকাল থেকেছে যার উত্তর দিতে হলে পাঠ্য বিষয়গুলোর ওপর সম্যক ধারণা থাকা দরকার। বিভিন্ন বই পড়লে সে-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধেয় পড়তে হয় না।

বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় 'পারিভাষিক' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বোধকরি ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। বলাধীন কোন বস্তু যখন বলের ক্রিয়াভিমুখে সরে তখন বলা হয় যে 'বস্তুর ওপর বল কার্য করছে।' এখানে 'কার্য' শব্দটার পরিবর্তে 'কাজ' শব্দটা ব্যবহার করা যাবে না। কার্য আর কাজ—এ শব্দ দুটো সমার্থক হলেও বিজ্ঞানে 'এরা তুল্যমূল্য নয়। 'কার্য' শব্দটি পদার্থবিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ ; কাজেই সমার্থক

(শেষাংশ 53 পৃষ্ঠায়)

স্কুটার সিগন্যাল সিসটেম

পার্থসারথি চক্রবর্তী

স্কুটার অথবা মোটর সাইকেলে চড়ে কোনও দিকে টার্ন নেবার সময় আরোহীকে প্রায়ই হাত দিয়ে সিগন্যাল দেখাতে হয়। এটা নিরাপদও নয় তাছাড়া দেখতেও ভাল লাগে না। বেশির ভাগ স্কুটারের প্রস্তুতকারকরা অবশ্য তাদের গাড়িতে এই সিগন্যাল সিসটেম লাগাতে চান-না, খরচ বেশি পড়বে এই অজুহাতে।

আমরা মজার ইলেকট্রনিক্সের কৌশল খাটিয়ে চমৎকার একটা স্কুটার সিগন্যাল সিসটেম বানিয়ে ফেলতে পারি। অবশ্য এজন্য ধৈর্য চাই, আর কিছু সময়ও যে দরকার তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ওর নাম দেওয়া যাক— Turn Signal Blinkers ;

বেশির ভাগ স্কুটার অথবা মোটর সাইকেলে ডায়নামো থেকে সীমিত কারেণ্ট উৎপন্ন হয়। এই সব জেনারেটর থেকে যে ভোল্টেজ পাওয়া যায় সেটা প্রায়ই বদলে যেতে থাকে এবং এর AC আউট পুট থেকে তোমার Blinker কাজ করবে না। কাজেই সাধারণ Blinker-এ এখানে কোনও সুবিধা হবে না। কিন্তু একটা ট্রানজিসটরাইস্ট Blinker ব্যবহার করা যেতে পারে। এইখানে কতকগুলি কথা মনে রাখা দরকার—

(1) এই Blinker System-এ (Fig. 1) রয়েছে— একটা পাওয়ার সোর্স (a) সুইচ (b) একটা Blinker ইউনিট এবং (c) একটা সিগন্যাল ইনডিকেটর ইউনিট (d) ; সমস্ত উপকরণগুলিকে একটি প্লাস্টিক অথবা অ্যালুমিনিয়াম-এর ছোট বাক্সের মধ্যে পুরে নেওয়া দরকার।

(2) সিগন্যাল-অপারেটিং সুইচ তোমার ডান অথবা বাঁ-দিকের হ্যাণ্ডেলের সুবিধাজনক কোনও এক স্থানে লাগাতে হবে যাতে সহজেই সেখানেই তোমার আঙুল পৌঁছতে পারে।

(3) সমস্ত জায়গাতেই Multi Stranded তার লাগান দরকার। সমস্ত বেড়িয়ে থাকা তারগুলি একত্র করে এক জায়গায় তুলে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে।

Fig. 1 (Left, top) The blinker system. (Left, bottom) The flasher light. (Right) The blinker positions on motorcycles and scooters

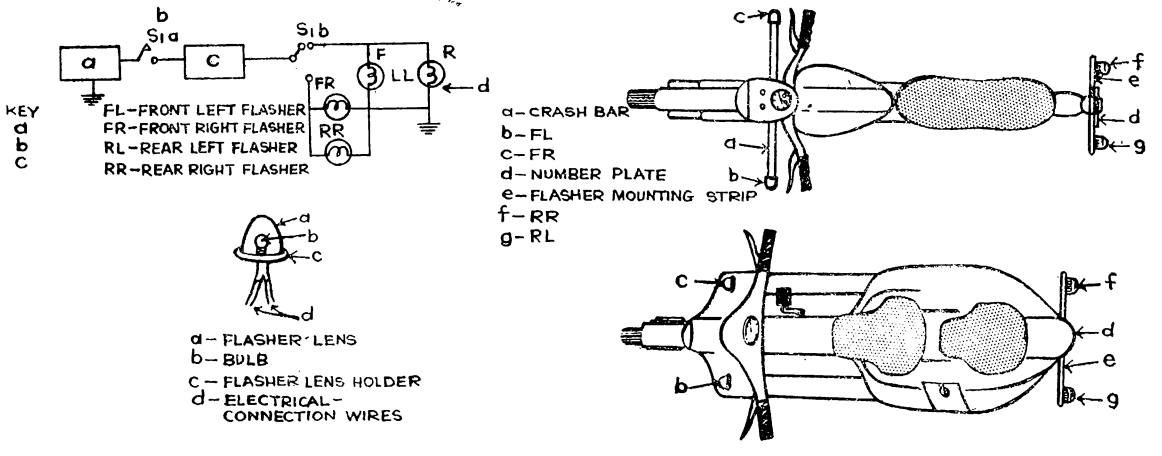

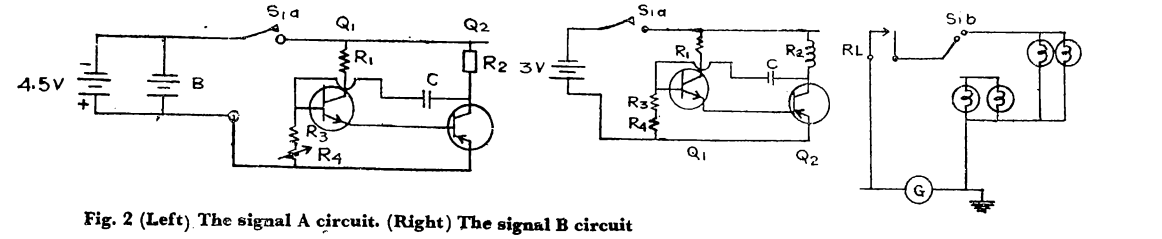

Fig. 2 (Left) The signal A circuit. (Right) The signal B circuit

(4) যাতে অন্য স্কুটার অথবা, মোটর সাইকেল আরোহী তোমার সিগন্যাল যে কোনও এ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে পান সে সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন (Fig-1) ; সিগন্যালের, আলোর রং amber পীতাভ তৈল স্ফটিকের লাল, হলুদ রং—দোকানে খোঁজ করলেই পাবে। হলে ভালো হয়—কারণ সেটা অনেক দূর থেকে দেখা যাবে। যেহেতু অনেক স্কুটারে জেনারেটর থাকে না তাই সেখানে Signal A ব্যবহার করতে হবে। যেসব বাইক অথবা স্কুটারে জেনারেটর আছে সেখানে চাই Signal B ;

Signal A ঃ এই সিসটেমের মধ্যে রয়েছে একটা ব্যাটারি-বক্স, ছ'টা D-Cell-এর জন্য সরঞ্জাম, ইলেকট্রনিক্স ফ্ল্যাসার এবং ফ্ল্যাসার। আটটা Cell-এর জন্য একটা ব্যাটারি বক্স ব্যবহার কর। যেহেতু তোমার দরকার লাগবে ছ'টা Cell, তাই অন্য কম্পার্টমেণ্ট ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ধরে রাখবে। এর সার্কিটের ডায়াগ্রাম বুঝানো হয়েছে Fig-2 (বাঁ-দিকে) ; পাওয়ায় সাপ্লাই আসবে 4·5 ভোল্ট থেকে। ফ্ল্যাসারে একটা relaxation আসিলেটর থাকবে।

যখন S_1a (আগের পাতায় ছবি দেখ Fig-1 বাঁদিকে) সুইচ টিপে কানেক্ট করা হবে তখন Q_1 এবং Q_2 relaxation আসিলেটরে পাওরার সাপ্লাই হতে থাকবে। স্বভাবতই এখন C-এর কাছে ভোল্টেজ নেমে আসবে R_2, R_3 and R_4-এর মধ্যে দিয়ে, যেহেতু Q_1 এবং Q_3 পরিবাহী নয়। যখন C চার্জড হবে, তখন Q_1-এর নিচে ভোল্টেজ নেবে যেতে সাহায্য করবে। এর ফলে Q_2 পরিবাহী হয়ে R_2-এর কাছে ভোল্টেজ উৎপন্ন করবে, করবে, স্বতস্ফূর্তভাবে C-কে ডিসচার্জ করে। আবার যেইমাত্র ক্যাপাসিটর চার্জ হতে শুরু হবে সঙ্গে সঙ্গে Q_1 অফ হয়ে গিয়ে Q_2-কেও অফ করে দেবে—যতক্ষণ পর্যন্ত C চার্জড না হচ্ছে। এইভাবে অন্-অফ্ এ্যাকসন অনবরত চলতে থাকবে। মনে রেখ R_2 হচ্ছে turn Signal বাল্ব।

এই সিসটেমে একটা 3 ভোল্ট Cell যেটা একটা ছোট্ট বাক্সের মধ্যে সার্কিটের সঙ্গে ঢোকানো আছে। যেমনি Cell 20 থেকে 50 mA কারেণ্ট দিতে থাকবে অমনি সেটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হবে, যেহেতু বাল্বের কারেণ্ট আসছে জেনারেটর সার্কিট থেকে। এই সার্কিটের (Fig 2) চেহারাও অনেকটা Signal A সার্কিটের মতোই। পার্থক্য শুধু এই যে R_2 এর জায়গায় একটা relay বসেছে। ট্রানজিসটর, Q 2—3 অবশ্য আলাদা এবং আলাদা R_3, R_4 ও C ;

এই সমস্ত সার্কিট তৈরি কধতে যদি প্রয়োজন মনে হয় তবে বড়দের কারও পরামর্শও নিয়ে নাও।

(51 পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কোন শব্দ দিয়ে একে প্রতিস্থাপিত করা যাবে না। সুতরাং, পদার্থবিজ্ঞানের বিচারে যা 'কার্য', তা কদাচ 'কাজ' নয়। অন্যান্য পারিভাষিক শব্দের ব্যাপারেও একথা প্রযোজ্য। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা, (definitions) লেখার সময় এবং বিভিন্ন সূত্রের বিবৃতি (statements) দেবার সময় বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে। সংজ্ঞা এবং সূত্র লেখার সময় শব্দ-ব্যবহারে মিতাচারী হতে হবে। একটি অনাবশ্যক শব্দও সেখানে বাঞ্ছনীয় নয়। একটি বাড়তি শব্দের উপস্থিতিতে, কিংবা একটি অপরিহার্য শব্দের অনুপস্থিতিতে পুরো সংজ্ঞা এবং সূত্রের অর্থ-প্রমাদ ঘটতে পারে। বাড়িতে বার বার লিখে অভ্যাস না করলে পরীক্ষার হলে প্রায়ই জানা বিষয়ের সংজ্ঞায় ভুল হয়, জানা সূত্রের ত্রুটিপূর্ণ হয়।

পরীক্ষার প্রশ্ন পেয়ে যদি দেখো সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই তোমার জানা আছে তখন 'কোন্ প্রশ্নটা ছেড়ে কোন্ প্রশ্নের উত্তর লিখবে ?' এই বাছাইটা কিন্তু ভেবেচিন্তে করা চাই। সব প্রশ্নের উত্তর লিখে একই রকম নম্বর পাওয়া যায় না। কাজেই, প্রশ্ন-বাছাই-এর ভুলেও অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষার নম্বর কমে যায়। যে-সব প্রশ্নে বর্ণনামূলক অংশ আছে সে-সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখলে বেশি নম্বর পাওয়া যায়। ভৌত বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্রে কিছু গাণিতিক প্রশ্ন থাকে। সেগুলো নির্ভুলভাবে উত্তর করতে পারলে পুরো নম্বরই পাওয়া যায়। কাজেই যারা ভৌত বিজ্ঞানে বেশি নম্বর পেতে চাও তারা ভৌত বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের অঙ্কগুলো ভালভাবে অভ্যেস করে নাও। এসব অঙ্কে বিভিন্ন ভৌত রাশির উল্লেখ করার সময় এদের এককের কথা লিখতে ভুলো না। কোন্ পদ্ধতির একক ব্যবহার করছো সে সম্পর্কে সজাগ না থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই 'পাউণ্ডাল'-এর পরিবর্তে 'ডাইন' লিখে বসবে, কিংবা 'জুল'-এর পরিবর্তে 'আর্গ'।

ওপরের কথাগুলো মনে রেখে এখন থেকেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকো। ফল নিশ্চয়ই ভাল হবে। লেখা শেষ করার আগে পরীক্ষায় তোমাদের সবার সুফল কামনা করছি, আর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি।

(18 পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিভিন্ন প্রমাণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি লক্ষ্য করা করা উচিত। কতক প্রমাণে দেখা যায় প্রমাণিতব্য বিষয় সরাসরি প্রমাণ করা হয়েছে, যেমন একই চাপের বা বৃত্তাংশের ওপর দণ্ডায়মান পরিধিস্থ কোণ সমূহ সমান ; এটি প্রমাণের সময় দেখানো হয় চাপের বা বৃত্তাংশের ওপর যে কোনো দুটি পরিধিস্থ কোণ একই কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক, অতএব পরিধিস্থ কোণ দুটি সমান। এই প্রমাণকে 'সরাসরি' প্রমাণ বলে।

আর এক ধরনের প্রমাণ আছে যেখানে প্রমাণতব্য বিষয়টি সরাসরি প্রমাণ না করে, এর কতগুলি বিকল্প সম্ভাবনা থাকে সেগুলিকে নাকচ করা হয় ; ফলে প্রমাণিতব্য বিষয়টির সত্যতা পরিস্ফুট হয়। ত্রিভুজের বৃহত্তর কোণের বিপরীত বাহু বৃহত্তর—এই উপপাদ্য প্রমাণের সময় সংশ্লিষ্ট বাহুদ্বয়ের মধ্যে ছোট এবং সমান বিকল্প সম্ভাবনা দুটি অসম্ভব দেখানো হয়।

অনেক সময় প্রমাণিতব্য বিষয়ের একটি বিপরীত প্রতিজ্ঞাকে সত্যবলে ধরে নেওয়া হয় এবং দেখানো হয় যে ফলস্বরূপ অসম্ভব কিছু ঘটেছে, অর্থাৎ বিপরীত প্রতিজ্ঞাটি মিথ্যা হলে প্রমাণিতব্য বিষয়টির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রমাণ প্রণালীর ব্যবহার গণিত শাস্ত্রের বিশাল অংশ জুড়ে সমাদৃত। একটি চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি দু'সমকোণ হলে, চতুর্ভুজটি বৃত্তস্থ হয়, এই উপপাদ্য প্রমাণের সময় এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

গণিতে বিভিন্ন প্রকার প্রমাণ সম্পর্কে আগ্রহশীল হলে এ্যাসোসিয়েশন ফর্ ইম্প্রুভমেণ্ট অব্ ম্যাথেমেটিক্স টিচিং সংস্থা (25 ফার্ন রোড, কলি-19) প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব্ ম্যাথমেটিক্স টিচিং পত্রিকার অষ্টম বর্ষের (1982) দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৃ 68-73) মুদ্রিত বর্তমান লেখকের Direct and indirect proofs in Mathematics নিবন্ধটি দেখা যেতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় যে পরীক্ষার্থী গতানুগতিক প্রমাণের ধারা অতিক্রম করে কোনো উপপাদ্যের নতুন প্রমাণ পরীক্ষার খাতায় লেখে। সে প্রমাণটি কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থ সমর্থিত হলে ভয়ের নেই, অন্যথায় প্রমাণে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থাকে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণ দুটি সমান প্রমাণ করার সময় শীর্ষবিন্দু থেকে ভূমির মধ্যবিন্দু যোগ করে উৎপন্ন ত্রিভুজ দুটি বাহু-বাহু-বাহু সর্বসমতা সূত্র প্রয়োগে সর্বসম দেখিয়ে ভূমিসংলগ্ন কোণ দুটি সমান দাবি করলে, সে প্রমাণটি ত্রুটিবহুল হবে। কারণ ত্রিভুজের বাহু-বাহু-বাহু সর্বসমতা উপপাদ্য প্রমাণের সময়, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণ দুটি সমান হয়-এই ফলটি ব্যবহৃত হয়েছে। যুক্তিবিদ্যার ভাষায় এই ধরনের ত্রুটিকে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ (Begging the Question) বলে। জ্যামিতি শাস্ত্রের ওপর প্রচুর দখল না থাকলে এবং খুব সূক্ষ্মবিচারশীল না হলে এই সব ত্রুটি নজরে পড়ে না। তাই পরীক্ষার খাতায় প্রচলিত প্রমাণ উত্তরে ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

উপসংহারে ভুল—আগেই বলা হয়েছে প্রমাণ সম্পূর্ণ না হলে পরীক্ষার্থী কোনো নম্বর পায় না। তাই প্রমাণের পর দুটি ছত্রে প্রমাণিত বিষয়টি উল্লেখ ক'রে উত্তরের সমাপ্তি রেখা টানা উচিত। উপসংহারটি লেখার সময় প্রশ্নপত্রের-প্রশ্নটি একবার দেখে নেওয়া উচিত, কারণ প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর না ক'রে অন্য একটি উপপাদ্যের প্রমাণ করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। প্রশ্নে আছে, প্রমাণ কর ত্রিভুজের বাহুগুলির লম্বসমদ্বিখণ্ডকত্রয় সমবিন্দু, কিন্তু পরীক্ষার্থী লেখে ত্রিভুজের কোনগুলির সমদ্বিখণ্ডকত্রয় বা মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু—এই উপ-পাদ্যগুলির প্রমাণ ; প্রশ্নে আছে বৃত্তের চাপের বা বৃত্তাংশের ওপর দণ্ডায়মান পরিধিস্থ কোন সমূহ সমান—প্রমাণ কর, কিন্তু পরীক্ষার্থী প্রমাণ করে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি দু-সমকোণের সমান ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বৃত্তের চাপ এবং বৃত্তাংশ এই দুটি পদ ভিন্ন অর্থবহ। তাই প্রমাণের পর উপসংহারটি লেখার সময় পরীক্ষার্থী ঠিক উত্তর করছে কি না সে বিষয় প্রশ্নপত্রের প্রশ্নটি আর একবার দেখে নিঃসন্দেহ হতে পারে।

এটি স্পষ্ট যে জ্যামিতির উত্তরদানে একটি ধরাবাঁধা নিয়ম অনুসৃত হয়, এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবার অবকাশ নেই। বাড়ীতে প্রচুর অভ্যাস করে পরীক্ষায় বসা উচিত। বাড়ীতে বারংবার অভ্যাসের মাধ্যমেই পরীক্ষার্থী পরীক্ষার উত্তরপত্রে নিজ উত্তরটি ত্রুটি মুক্ত করতে সফলকাম হবে। বাড়ীর অভ্যাসটি পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত প্রমাণের সঙ্গে পরীক্ষার্থী অবশ্যই মিলিয়ে নেবে এবং নিজের ভুল নিজেই সংশোধন প্রয়াসী হবে যাতে পরীক্ষার উত্তরপত্রে কোনরকম ভুল থাকার সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। সুযোগ থাকলে ভুল সংশোধনের জন্য কোনো উপযুক্ত শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্যে এবং উপদেশ গ্রহণ করলে আরও ভাল হয়। বলা বাহুল্য, পরীক্ষাকক্ষে পরীক্ষার্থী নিজ উত্তরটিও খাতা জমা দেবার প্রাক্কালে একবার নিরীক্ষণ করবে, কারণ তারা হয়ত জানে না যে পরীক্ষার উত্তরপত্রে তারা অজান্তে এবং অসাবধানে অনেক কিছু অযৌক্তিক, হাস্যকর এবং মারাত্মক ভুল লিখে আসে, যার মাশুল তাদেরই শেষে দিতে হয়।

28।4।2।1B শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা-26

এক ডজন নতুন বই

পাঁচটি কিশোর ক্ল্যাসিকস্

অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ বিন্নি ধানের খই ৮
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ কিশোর গল্প সমগ্র ৩০
হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ প্রেতাত্মার প্রতিশোধ ৮
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ॥ হারানো কাকাতুয়া ১০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০

পাঁচটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

সমরজিৎ কর ॥ পরমাণু প্রসঙ্গ ১৫
জয়ন্ত বসু ॥ পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময় ১৫
অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস্ ১০
পার্থসারথি চক্রবর্তী ॥ বুদ্ধি নিয়ে খেলা ১০
বিমান বসু ॥ নক্ষত্র পরিচয় ১০

এবং দুটি অতি প্রয়োজনীয় বই

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

স্টুডেন্টস বুক অফ নলেজ ৫০

অমরনাথ রায় সম্পাদিত

স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

ছোটদের বইয়ের স্বপ্ন রাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কল-৯

ছোটদের জন্যে কলম ধরেছেন বর্ষীয়ান লেখক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ···

কারণ আজকের দিনের স্কুলের ছেলেমেয়েদের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পড়তে হয় অনেক বই। শুধু সিলেবাসের পড়া সম্পূর্ণ করার জন্যই নয়, অজানাকে জানার আগ্রহ ও তাদের খুব। অথচ স্কুলের ছেলেমেয়েদের অসীম কৌতূহল মেটাতে পারে এমন প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা খুবই অল্প। তাই ছোটদের জন্যে বিশেষতঃ স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য একখণ্ডে সম্পূর্ণ একটি সাধারণ জ্ঞানের বই (বুক অব নলেজ) প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যে পরিকল্পনাকে সফল করতে এগিয়ে এসেছেন কুড়িজন সেরা লেখক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ যাঁদের লেখার সঙ্গে ছোটরা বিশেষভাবে পরিচিত।

বিচিত্র এই পৃথিবী গঠন কেমন, কবে, কিভাবে পৃথিবীর বুকে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়েছিল—সেইসব বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের পর কিভাবে আবির্ভাব হল মানুষের ? মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসও বড় রোমাঞ্চকর ইতিহাস। এই পর্যায়ে লিখবেন :

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু পাত্র, সলিল রাহা, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ধীরেন্দ্রলাল ধর ও নারায়ণ সান্যাল।

শিল্প ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়ে চলল বিজ্ঞানের জয়রথ। গুহাবাসী মানুষের আগুনের ব্যবহার থেকে শুরু করে আজকের মানুষ এসে পৌঁছেছে ইলেকট্রনিক্স-এর যুগে। শুধু পৃথিবীর বুকেই মানুষ নিজেকে আটকে রাখেনি, পাড়ি জমিয়েছে মহাকাশের বুকে, অভিযান চালিয়েছে সমুদ্রের অতলে। আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষ খুঁজে বেড়িয়েছে তার আনন্দের উপকরণও। বিজ্ঞানের গবেষণা ও সাফল্যের আনুপূর্বিক বিবরণ লিখবেন :

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অমরনাথ রায়, অজয় চক্রবর্তী, বিমান বসু, সমরজিৎ কর, সিদ্ধার্থ ঘোষ, অজয় দাশগুপ্ত, সুবীর দত্ত, সিদ্ধার্থ রায়, অমিত চক্রবর্তী, রজত রায় এবং পার্থসারথি চক্রবর্তী।

আর কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের এই সুজলা সুফলা পৃথিবীর ? এবং আমাদের এই বর্তমান পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ পরিণতিই বা কী—এ নিয়ে লিখবেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদার।

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

স্টুডেন্টস বুক অব নলেজ

ক্যুইজ কনটেস্ট

ফেব্রুয়ারী 1987

মান : VI—VIII

1. 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' কে রচনা করেছিলেন ?
2. নিউরোনের প্রধান অংশকে কি বলা হয় ?
3. ওমর খৈয়াম কে ছিলেন ?
4. নিচের কোন্‌টি উপগ্রহ ?
   (ক) শুক্র (খ) চন্দ্র (গ) সূর্য
5. 'হাজার দুয়ারী' কোথায় অবস্থিত ?
6. কোন্ তারিখে পৃথিবীতে দিন ও রাত্রি সমান হয় ?
7. সূর্যরশ্মি যেখানে লম্বভাবে পড়ে, সে জায়গাকে কি নামে অভিহিত করা হয় ?
8. স্যাকারিন-এর উৎস কি ?
9. একটি মূলহীন জলজ উদ্ভিদের নাম বলতে পার কি ?
10. 'টাইকো ব্রাহে' কে ছিলেন ?
11. ONGC কথার অর্থ কি ?
12. শের শাহের আসল নাম কি ছিল ?

আই-কিউ-টেস্ট—ফেব্রুয়ারী '87

1. A এবং B যখন পরস্পরের দিকে দৌড়তে আরম্ভ করল তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব ছিল 20 কি.মি.। A ঘণ্টায় 3 কি.মি. এবং B ঘণ্টায় 2 কি.মি. বেগে দৌড়তে পারে। কতক্ষণ পরে তারা পরস্পর মিলিত হবে ?

2. নিচের লেখা সংক্ষিপ্ত নামগুলির সম্পূর্ণ নাম কি হবে ?
(a) D L. O, (b) E. C. M. (c) I. B. R. D. (d) C. I. A. (e) P. L. O.

3. তরঙ্গ গতিতে—
(a) কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না, (b) মাধ্যমের কণাগুলি তরঙ্গের সঙ্গে চলে, (c) মাধ্যমের কণাগুলি সর্বদা স্থির থাকে, (d) মাধ্যমের কণাগুলি তাদের মধ্য অবস্থানের সাপেক্ষে স্পন্দিত হয়।

4. মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য কোন আইসোটোপ ব্যবহৃত হয় ?

5. নিচের কোন্‌টি অক্সি অ্যাসিড গঠন করে না ?
(a) আয়োডিন, (b) ফ্লোরিন, (c) ব্রোমিন,

ফটো ক্যুইজ

ফেব্রুয়ারী 1987 মান : VI—VIII

নিচের ছবিটি একজন বিশিষ্ট নোবেলজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানীর। নাম বল।

ডিসেম্বর 1986 সংখ্যায় প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সমাধান

1. কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। 2. হর্ষবর্ধনের সভাকবি। 3. পাবাপুরীতে। 4. সাহারা মরুভূমি। 5. তিনটি। 6. 1·68 মিটার। 7. দু'টি। 8. ক্রিকেট। 9. ব্রাজিলে, কফি ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। 10. মাদ্রাজে।

ডিসেম্বরে প্রকাশিত জুনিয়র ফটোক্যুইজের সমাধান : পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির

বুদ্ধি শুদ্ধি

পাখি কেন পাখি ?

উড়তে পারে বলে ?

সে ত মশা মাছিরাও উড়তে পারে। বাদুড়ও ওড়ে। কিছু মাছও উড়তে পারে। এমন কি এরোপ্লেনও। সুতরাং যারাই উড়তে পারে তারাই পাখি নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যে পাখি সেই কিন্তু উড়তে পারে না। উটপাখী।

ডিম পাড়ে তাই ?

তাও কিন্তু নয়। ডিম ত অনেকেই পাড়ে। সাপ-ব্যাঙও ডিম পাড়ে। যারা ডিম পাড়ে তারাই পাখি এ ধারণা করলে ত তুমি একটি ডিম পেলে।

শক্ত সরু ঠোঁট আছে বলে ?

দ্যাখো কিছু কিছু মাছ আছে যাদের সরু আর শক্ত ঠোঁট আছে। অতএব ঠোঁট থাকলেই পাখি হয় না।

গান গাইবার জন্য ?

অনেক কীট-পতঙ্গ, ঘাসফড়িং কিন্তু গান গায়। ধর তুমিও ত গান গাইতে পারো। তাহলে গান গাইতে পারলেই পাখি হতে পারলো না।

বাসা বানাবার জন্য ?

হ্যাঁ, এটা একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার নিঃসন্দেহে। তবে এটাও সব নয়। খরগোশ, ইঁদুর এমন কি মৌমাছি আর পিঁপড়েও সুন্দর বাসা বানাতে পারে। সুতরাং বাসাও নয়।

তাহলে কিসের জন্য পাখিরা আলাদা ? ওড়া নয়, ডিম নয়, ঠোঁট নয়, গান নয়, নয় বাসা-টাসা।

পালক পালক !

একমাত্র পাখিরাই পালক পেয়েছে। পাখির পালক খুবই মজবুত আর খু-উ-ব হাল্কা হয়। রঙ বেরঙের পালকের জন্য পাখিরা যে দেখতে সুন্দর তাই নয়, এই পালকই পাখির শরীরকে গরমের সময় শীতল আর শীতের সময় উষ্ণ রাখে। এই পালকের সাহায্যেই ওরা উড়তে পারে সুন্দর।

এখন বোঝা গেল পাখি কেন পাখি হল। এবার তোমার চুলে একটি পালক গুঁজে বন্ধুকে এ প্রশ্নটা করো।

লেখা ও ছবি ঃ সমীর মণ্ডল

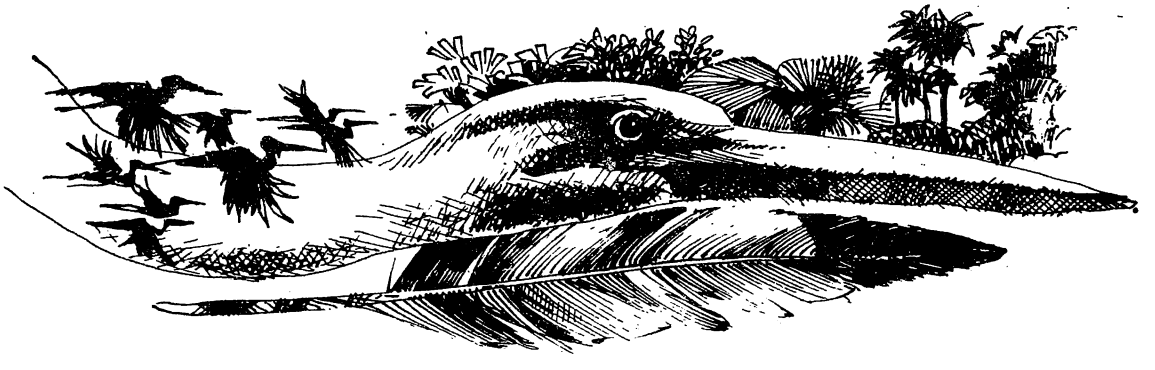

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে-এর উত্তর

এখানে আসলে একটা জিনিসকে দুবার করে দেখানো হচ্ছে আর কি। শনি-রবিবারের 104 দিন আর লম্বা ছুটির 60 দিন দেখানো হয়েছে। আবার খাওয়া, ঘুম ও খেলার জন্য সময়গুলো 365 দিনের জন্যই হিসাব করা হয়েছে। দ্যাখো ঐ শনি-রবি এবং লম্বা ছুটির মধ্যে ত খাওয়া, ঘুম ইত্যাদির সময়ও রয়েছে।

জয়তি

প্রায় দুই মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট, ঘন ঝোপ-ঝাড়যুক্ত হয় না অথচ মাধুর্যযুক্ত চিরহরিৎ গুল্ম বিশেষ। পাতা একান্তর, উপপত্রযুক্ত, সবৃন্তক, পাতার আকার বেহালাকৃতি কিন্তু পাদপ্রান্ত তাম্বুলাকার, দুইদিকের ধারে 3-4টি গ্রন্থিদাঁত আছে। পাতা লম্বায় প্রায় 10 সে.মি, ও চওড়ায় 5 সে.মি. হয়। মসৃণ, ওপরতল গাঢ় সবুজ, নিচতল হাল্কাসবুজ হয়। উপপত্র আকৃতিতে ছোট। পত্রবৃন্ত প্রায় 3·5 সে.মি লম্বা হয়।

পুষ্পবিন্যাস নিয়ত। অর্থাৎ এই ধরনের পুষ্পবিন্যাসে ফুলগুলি একই তলে থাকে। মঞ্জরীদণ্ডের আগায় ফুলটি আগে ফোটে, নিচের ফুলটি সবশেষে ফোটে এবং ইহার বৃদ্ধি নির্দিষ্ট। পুষ্পবৃন্ত সরু ও রঙ লালচে সবুজ হয়। ভিন্নবাসী অর্থাৎ স্ত্রীপুষ্প ও পুংপুষ্প ভিন্ন গাছে হয়। পুংপুষ্পের বৃতি স্ত্রীপুষ্পের বৃতি অপেক্ষা ছোট হয়। বৃত্যংশ 5টি, বেগুণীলাল, দলমণ্ডল লাল, পাঁপড়ি পাঁচ। পুংস্তবকে পুংকেশর 8টি তার মধ্যে 4টি লম্বা ও 4টি ছোট। পুংদণ্ডগুলি একটি স্তম্ভের সঙ্গে যুক্ত থাকে। পরাগধানী লালচে হলুদ রঙের হয়। স্ত্রীপুষ্পের গর্ভশিয় ডিম্বাকৃতি, মসৃণ, গর্ভদণ্ড তিনটি থাকে। ফল ক্যাপসিউল, গোলাকৃতি, বেগুণীসবুজ রঙের হয়।

উপরে বর্ণিত ফুলগাছটির নিবাস কিউবা। বর্তমানে ভারতের বাগানগুলিতে শোভা বিস্তার করে চলেছে। এই ফুলগাছটির বৈজ্ঞানিক নামকরণ জ্যাট্রোফা প্যানডুরিফোলিয়া (Jatropha Pandurifolia Andr)। হেনরি সি. অ্যানড্রিউস (Hehry C. Andrews) এই গাছটি বর্ণনা করেন। গ্রীক ভাষায় জ্যাট্রোফা কথাটি দুটি গ্রীক শব্দের সমষ্টি যেমন জ্যাটরস (Jatros) ও ট্রোফি (Trophe) এর সমষ্টিগত অর্থ ঔষধিগত ব্যবহার। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় এই বর্গের বেশ কিছু ঔষধি গাছরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রজাতির নামকরণ এই ফুলগাছটির পাতার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করে। কারণ ল্যাটিন ভাষায় প্যানডুরিফোলিয়া কথার অর্থ ফিড্‌ল্‌ শেফেড লীফ। ফিড্‌ল কথার অর্থ বেহালা। কার্যত দেখা যায় এই গাছটির পাতা বেহালাকৃতি।

পরবর্তীকালে নিকোলাস জোসেফ জ্যাকুইন এই ফুল গাছটির নাম পরিবর্তন করেন এবং নাম হয় Jatropha integerrima Jacq. ইহা ইউফোরবিয়েসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

সারা বছরই এই ফুলগাছটি ফুলে ভরে থাকে। তবে বর্ষায় ফুলের সমারোহ অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

শীতকালে এই ফুল-গাছটির ডালগুলি ছেঁটে দিতে হয়। এই ফুলগাছটির ফুলের রঙ লাল ছাড়াও গোলাপী হাল্কা গোলাপী বা সাদাটে গোলাপী রঙের হয়। আর এই গাছটির বৃদ্ধি খুব সহজেই কাটিং ও বীজ দ্বারা হয়।

এণাক্ষী বিশ্বাস

★★★

[ফটো ঃ সুবলকৃষ্ণ দে]

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় ● জয়ন্ত দত্ত

ডিসেম্বর '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে :

1. **ইন্দ্রশ্রী জানা**, প্রযত্নে, এইচ. আর. জানা, A E. 82, সল্ট লেক সিটি, সেক্টর-1, কলকাতা-700 064।
2. **দেবাশীষ শেঠ**, প্রযত্নে, গোপাল চন্দ্র শেঠ, মজুমদার গড়, পোস্ট—চন্দননগর, হুগলী—712136।
3. **লিপিকা বীর**, প্রযত্নে, মলয় বীর, 17, বিশ্বম্ভর মল্লিক লেন, কলকাতা-700 005।

ডিসেম্বর '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্ট-এ সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :

কলকাতা : সঞ্জয় সিনহা রায়, স্মলতা বসাক, সৌরভ বসু, অনির্বাণ সান্যাল, দীপ্তনীল সেনগুপ্ত, অনির্বাণ রায়, মধুমিতা সাহা, অনিন্দ্যসুন্দর মিত্র, রণজিৎ কুমার গোস্বামী, অভিজিৎ রায়, প্রদীপ ঘোষ, জুঁই কুণ্ডু, সাহানা নিয়োগী, বনানী সরকার, শুক্লা চৌধুরী, রাজা ভট্টাচার্য, অবিনাশ দাস, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মহুয়া ঘোষ, অনির্বাণ দত্ত, আনন্দ শঙ্কর রায়, দীপাংশু বসু চৌধুরী, সুপর্ণা দত্ত, সোমা গোস্বামী, অসীমকৃষ্ণ দাস।

24-পরগনা : অর্ণব বসু, শ্রীকুমার দে, তুহিন ঘটক, রূপম ভৌমিক, প্রমিত ঘোষ, মাধাই সাধন ঘোষ, সুমনা নস্কর, পাপিয়া নস্কর, কমলেশ মারিক, শুচিস্মিত ঘোষ, সুবীর চৌধুরী, শুভজ্যোতি চক্রবর্তী, সৌম্য নস্কর, অর্ণব রায় চৌধুরী, অঞ্জন সেনগুপ্ত, গৌতম মণ্ডল, অপর্ণা বিশ্বাস।

হাওড়া : ডরোথি ঘোষ, বর্ণালী সামন্ত।

হুগলী : সৌমেন মণ্ডল, রাণা ব্যানার্জী, স্বরাট মুখোপাধ্যায়, সৈকত বিশ্বাস, প্রণব কুমার রক্ষিত, পৃথিবরাজ মোদক, অনামিকা বসাক, সুবীর ভট্টাচার্য, মৃণ্ময় কুমার মজুমদার, রঞ্জিত ঘোষ চৌধুরী, চন্দন দাস, সৌগত দত্ত, দেবাশিস মল্লিক, নিলয় চক্রবর্তী, সুজিত বিশ্বাস, স্মরজিৎ ভট্টাচার্য, কাবেরী মাইতি।

বর্ধমান : অভিজিৎ গোস্বামী, হিমাংশু ঘোষ, মাধব ঘোষ দস্তিদার, সুহাসী বেগম, করবী গরাই, কুন্তল রায়, স্নিগ্ধা উপাধ্যায়, শিবাজী রেজ, অনিরুদ্ধ রায়, রামপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক লাহা, বনানী বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিস রায়, প্রশান্ত দেবনাথ, স্বরূপ ব্যানার্জী, অনির্বাণ গুহ, প্রদীপ দাস।

মেদিনীপুর : সন্দীপন দাস, পুলক প্রধান, সুব্রত কুণ্ডু, দুর্লভ ব্যানার্জী, সব্যসাচী দাস, সৌমেন্দু কুমার জানা, পিয়াল বায়েন, কৌশিক ধাড়া, জয়ন্ত দত্ত মজুমদার।

নদীয়া : ছন্দোময় মণ্ডল, অনির্বাণ দাস, অমিতাভ চৌধুরী, বিকাশ কোলে।

মালদহ : অরুণায়ন শর্মা, মানসী হাজরা চৌধুরী।

বীরভূম : এ রহিম, বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়। **বাঁকুড়া :** অংশুমান কর, রূপাঞ্জন সাহা।

ডিসেম্বর 86'-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারে নি :

অক্টোঃ-নভেঃ '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **অপর্ণা বিশ্বাস**—প্রযত্নে, সূর্যকান্ত বিশ্বাস, গ্রাম+পোস্ট—জগৎবল্লভপুর, হাওড়া।
2. **নিতাই বসাক**—প্রযত্নে, লক্ষ্মীনারায়ণ বসাক, কৃষ্ণপুর, রবীন্দ্রপল্লী, সুশীল জ্যোতি অ্যাভেনিউ, প্রফুল্ল কানন (দেশবন্ধু নগর), কলকাতা -700 059।
3. **সব্যসাচী ভট্টাচার্য**—প্রযত্নে, সমীর নাথ ভট্টাচার্য, গ্রাম+ডাক—হরিনাভি, 19/1, আর. এন. টি. রোড, দক্ষিণ 24-পরগনা।

ডিসেম্বর '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে।

কলকাতা ঃ সৌমেন মণ্ডল, শুক্লা চৌধুরী, জয়ন্ত ধর, মহুয়া ঘোষ।
24-পরগনা ঃ অরিন্দম দাশমাজী, মৃগাঙ্ক দে সরকার, শুভঙ্কর বিশ্বাস, তপনকুমার মণ্ডল, মুকুল সরকার, সুমনা নস্কর, সৌমেন ভৌমিক, রূপম ভৌমিক, সেখ তাজউদ্দিন, শুভজ্যোতি চক্রবর্তী।
হাওড়া ঃ ডরোথি ঘোষ।
হুগলী ঃ রজত ঘোষ চৌধুরী।
বর্ধমান ঃ শ্যামশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, অতনু গুপ্ত, ঋত্বিক লাহা, শম্পা কিসকু, অভিজিৎ গোস্বামী, স্নিগ্ধা উপাধ্যায়, দেবাশিস পানি, তরুণতপন গরাই।
মেদিনীপুর ঃ দীপেশ করণ, জয়ন্ত দত্ত মজুমদার, মৃণালকান্তি কুণ্ডু, সন্দীপন দাস, প্রদীপ দাস।
নদীয়া ঃ মৈত্রেয় মণ্ডল, প্রিয়ব্রত বিশ্বাস, সিদ্ধার্থশঙ্কর মুখার্জী, ছন্দোময় মণ্ডল।
বীরভূম ঃ বসির আহমেদ, সীমা কুণ্ডু। **বাঁকুড়া ঃ** রূপাঞ্জন সাহা, সৌম্য চ্যাটার্জী।
কোচবিহার ঃ রবীন্দ্রনাথ হিসাবিয়া। **দার্জিলিঙ্ ঃ** ধ্রুবদাস মহলানবীশ।

অক্টোঃ-নভেঃ'86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **অনুপম বসুসরকার**—প্রযত্নে, অম্লান কান্তি বসুরায়, কাঁটাপুকুর, পোঃ মগরা, হুগলী—712148।
2. **কৌশিক বাগচী**—প্রযত্নে, অনিতা চক্রবর্তী, 26/1, ভানার লেন, বেলঘরিয়া, কলকাতা—700 056।
3. **গৌতম দে** -17/8, রাজা রাজ কিষণ স্ট্রীট, কলকাতা—700 006।

অক্টোঃ-নভেঃ '86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ জয়ন্ত ব্যানার্জী, কুন্তল চক্রবর্তী, দীপঙ্কর ব্যানার্জী, হৈমন্তী চৌধুরী।
24-পরগনা ঃ রুণু নিয়োগী। **হাওড়া ঃ** বরুণ বিশ্বাস, শ্যামল সাধু খাঁ।
হুগলী ঃ রাজেশ শেঠ, সৌম্য ভট্টাচার্য।
বর্ধমান ঃ শুভ্রজিৎ ব্যানার্জী, শ্রাবণী গরাই, পার্থপ্রতিম লাহা, দেবজ্যোতি বিশ্বাস, সুখেন্দুবিকাশ চৌধুরী, আশিস মণ্ডল, অজিত দাস।
মেদিনীপুর ঃ পুলিন বিহারী সাউ, রাজেশ গিরি, শান্তনু দিণ্ডা, সেখ মসিয়ুর রহমান, চৈতালী কুণ্ডু, অভিজিৎ সরকার।
নদীয়া ঃ শ্রীদাম সরকার।
বীরভূম ঃ সুদীপ্ত সেনগুপ্ত, অরিন্দম কুমার দাস। **বাঁকুড়া ঃ** সুব্রত কুমার পাত্র।

অক্টোঃ-নভেঃ '86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ফোটো ক্যুইজের সঠিক উত্তর একজন মাত্র দিতে পেরেছে ঃ

1. তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রযত্নে, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, B_2-351/2, ভি. কে. নগর, দুর্গাপুর-10, বর্ধমান।

ক্যাসিও

সৌগত দত্ত

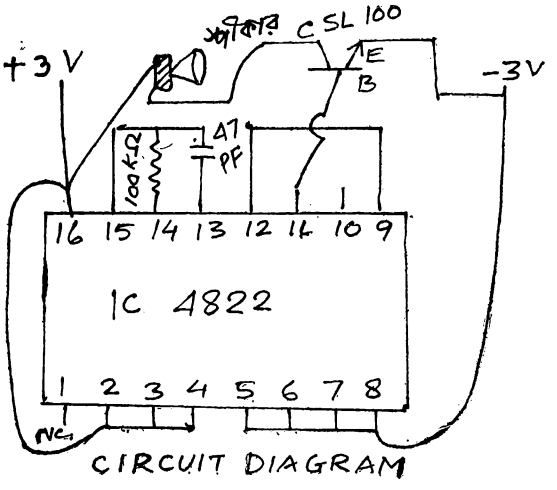

আজ তোমাদের ক্যাসিও তৈরির পদ্ধতি বলে দেব। এই ক্যাসিও থেকে তোমরা ষোল রকমের Music শুনতে পাবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি হল—

1. একটি IC 4822
2. স্পীকার
3. ট্রানজিস্টার SL 100।
4. রেজিস্টার 100 Kr
5. IC বেস একটি
6. ভোরোবোর্ড একটি
7. PF 47 একটি
8. ব্যাটারি (3V)

প্রথমে ভোরোবোর্ডের উপর IC বেসটা ঝালাই কর। তারপর IC টা IC বেসের উপর বসিয়ে দাও। IC এর 2, 3, 4 পয়েন্ট জুড়ে 16 নম্বর পয়েন্টে ঝালাই কর। 16 নম্বর থেকে একটি তার যাবে স্পীকারে এবং অপর তার যাবে ব্যাটারি +3V এ। IC এর 5, 6, 7, 8 একসঙ্গে ঝেলে ঐ তারটা সোজা SL 100 এর E (রেমিটার) মিটারের সঙ্গে ঝালাই কর। SL 100 এর বেসটা (B) 11 নম্বর এবং কালেকটার (C) প্রান্তটি স্পীকারের সঙ্গে ঝেলে দাও। 9 এবং 12 নম্বর যুক্ত কর। PF 47 এর একটি প্রান্ত 13 নং এবং অপর প্রান্ত 15 নম্বরে ঝালাই কর। এবার রেজিস্টারের এক প্রান্ত 14 নম্বরে এবং অপর প্রান্ত 15 নম্বরে যাবে। এবার 8 নম্বর থেকে একটি তার সোজা ব্যাটারি (−V)তে যুক্ত কর। কাজ শেষ করে CIRCUIT DIAGRAM এর সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

ভেরোবোর্ড IC বেস ঝালার আগে অপর পিঠের তামার প্রলেপ কিছুটা ছুলে নেবে।

C/o. কল্পনা দত্ত। পোঃ বুড়োশিবতলা, চুঁচুড়া, হুগলী।

অভিনব রেফ্রিজারেটর

অরুণ কুমার রায়

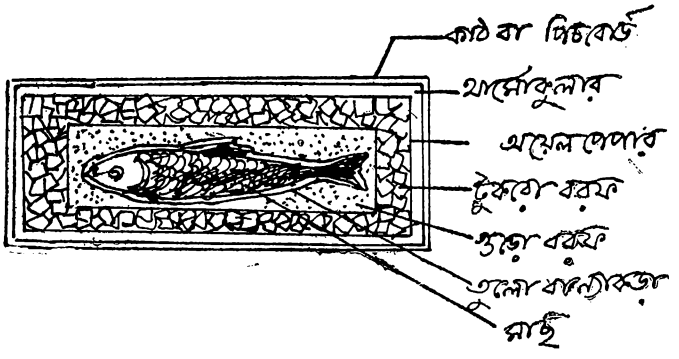

এই মডেলটি জীববিজ্ঞান পর্যায়ের। এটি একটি উন্নত ধরনের সংরক্ষণ পদ্ধতি। শুধু যে মজার ব্যাপার তা নয়, এতে পয়সার সাশ্রয় হয়, তার চেয়েও বড় কথা অসময়ে তাজা জিনিস পাওয়া যাবে। পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রয়োজন হবে কয়েকটা ছোটো জ্যান্ত মাছ (যেমন বাটা, ছোটো রুই / কাতলা, ট্যাংরা ইত্যাদি), প্রয়োজন মত বরফ (1/2 কেজি), কাঠের বা শক্ত পিচবোর্ডের একটা শক্ত বাক্স থার্মোকুলার অয়েলপেপার তুলো বা ন্যাকড়া, জল ইত্যাদি।

বাক্সটার ভিতর দিকে সমস্ত দেওয়ালগুলো থার্মোকুলার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বাক্সের সাইজ ইচ্ছামত করা যাবে, আপাততঃ ব্যাটারির বাক্স যোগাড় করলেই যথেষ্ট)। এরপর থার্মোকুলারগুলো ঢাকতে হবে অয়েশ পেপার দিয়ে। ঢাকনা খোলা রেখে বাক্সের নিচেটা ইঞ্চিখানেক সুরু করে টুকরো বরফে ঢেকে আধ ইঞ্চি পুরু গুঁড়ো বরফ ছড়াতে হবে। এখন কয়েকটা জ্যান্ত মাছকে জলে ছেড়ে তার মধ্যে বরফের টুকরো ছাড়তে হবে যতক্ষণ না মাছ গুলো নিশ্চল হয়ে পড়ে। এরপর মাছগুলোকে তুলো বা ন্যাকড়া জড়িয়ে বরফের উপর পাশাপাশি শুইয়ে দিয়ে প্রথমে গুঁড়ো বরফ তার ওপর টুকরো বরফ ঢেকে বাক্স বন্ধ করা হবে। লক্ষ রাখতে হবে মাছের চারিদিক যেন গুঁড়ো বরফ আর গুঁড়ো বরফের চারিদিকে যেন টুকরো বরফ থাকে এবং তা থাকবে যথাসম্ভব ফাঁক না রেখে। এরপর বাক্সটিকে এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে সহজে বরফ না গলে।

দু এক দিন পরে মাছগুলো সাবধানে বের করে সাধারণ জলে ছাড়লে দেখা যাবে তারা আবার সাঁতার কাটছে। বরফ না গললে মাছগুলো এক থেকে দু সপ্তাহ পর্যন্ত জীবন্মৃত বা অ্যাবায়োসিস অবস্থায় থাকতে পারে, এমন কি পার্শ্বেলে অন্য কোনো স্থানে পাঠানো যায়।

বন্ধুর বাড়ীতে আচমকা এ ধরনের উপহার পাঠানো যায়। ভাবে তো বন্ধু কেমন আশ্চর্য হবে!

ইস্টার্ন সায়েন্স ক্লাব, পোঃ থালিয়া হাওড়া।

শব্দকূট কনক কিরণ ঘোষ

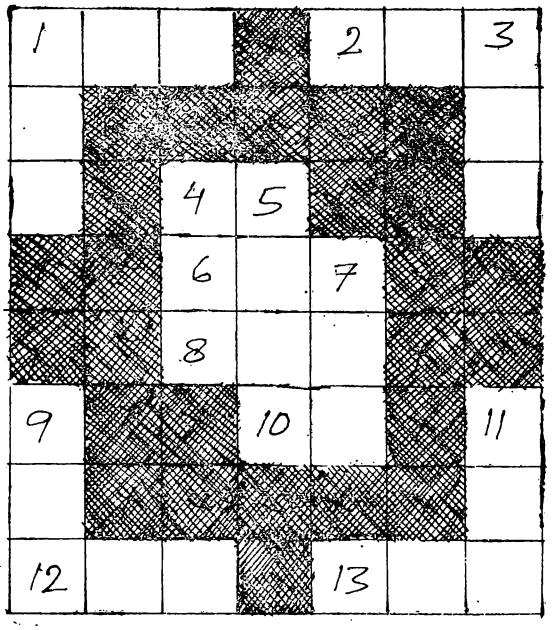

সূত্র ঃ—

পাশাপাশি ঃ

1. পুঁটি মাছের অপর নাম।
2. সূর্যের প্রভা।
4. একটি ছোট্ট নদী।
6. উদ্ভিদের নাম।
8. বিখ্যাত ঔপন্যাসিক কবি ও রাজনীতিজ্ঞ।
10. তরল পদার্থ যার মধ্যে দিয়ে যেতে সক্ষম
12. দৈনন্দিন জীবনে যা ছাড়া বাঁচা যায় না।
13. একটি রেচন পদার্থ।

উপর নিচে ঃ

1. লক্ষ্মণের কণিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা।
3. আসলের বিপরীত।
5. একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী
6. যে ফুলটি পেতে হলে কণ্টক জ্বালা সহ্য করতে হয়।
7. যার রাসায়নিক সংকেত C_6H_5OH
9. মানবদেহের একটি অস্থি।
11. একটি হালকা হলুদ বর্ণের জলে অদ্রাব্য পদার্থ।

কেশিগ্রাম—বর্ধমান

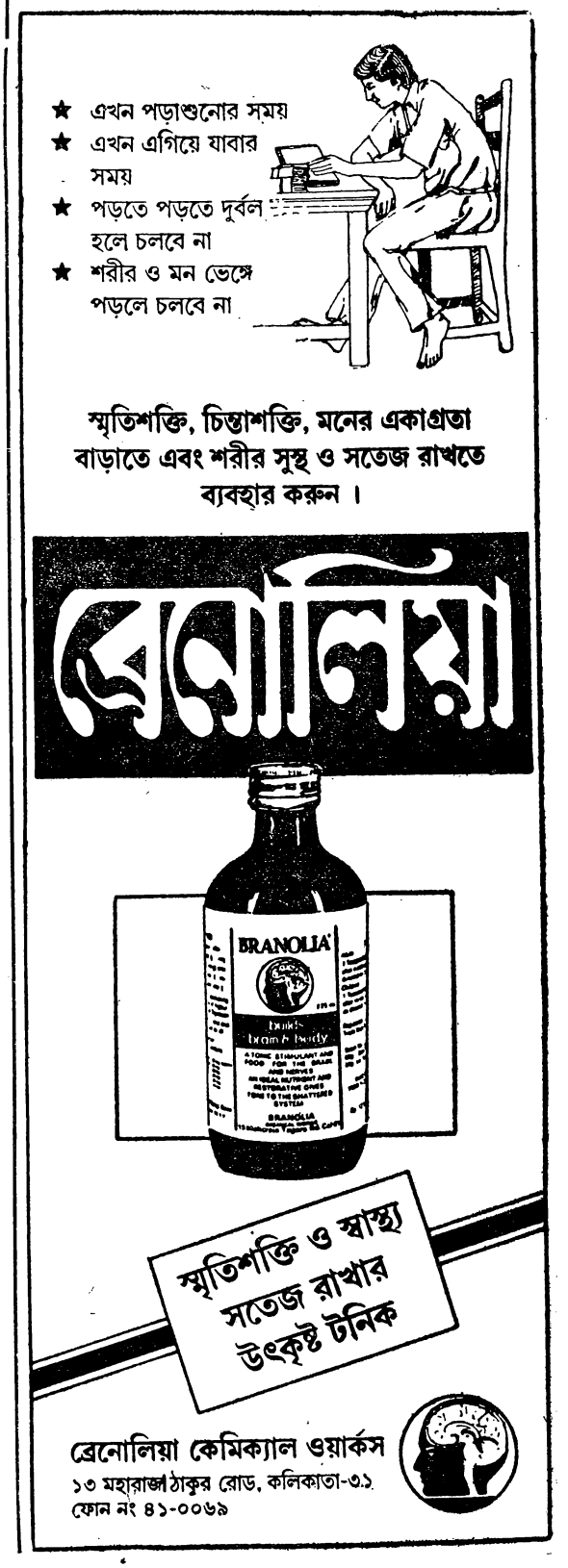

বিজ্ঞান প্রশ্নোত্তর

প্রঃ 1. সূর্যসভা কি? (1) রবিকুল সালাম, করিমপুর, বীরভূম এবং (2) নন্দ কর্মকার, ভোজুড়ি, ধানবাদ।

উঃ আকাশ মেঘলা না থাকা সত্ত্বেও কোন কোন দিন, বিশেষ করে বৃষ্টিকালে সূর্যের চারদিকে একটা গোলাকার সাত রঙা বলয় দেখা যায়। একেই বলা হয় সূর্য সভা।

উক্ত ঘটনাটি খুব উপরে অত্যন্ত পাতলা মেঘ সূর্যকে আড়াল করলেই দেখা যায়। এত পাতলা যে আমাদের চোখে মেঘের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। যেহেতু মেঘ বলতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা, যা ধূলিকণাকে অবলম্বন করে ভেসে বেড়ায়, তাকেই বুঝি? সূর্যের সাদা আলো ঈষদ স্বচ্ছ মাধ্যম ঐ মেঘের জলকণার দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়ে সাতরঙা বলয় সৃষ্টি করে। তবে আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়মগুলিও উক্ত বলয় সৃষ্টিতে বেশ কিছুটা কাজ করে থাকে। আর সূর্যসভার ব্যাসও নির্ভর করে জলকণার আকারের উপর।

সূর্যের মত চন্দ্রসভাও দৃষ্ট হয় এবং এক্ষেত্রেও সেই একই নীতি প্রযোজ্য। তবে রাত্রিতে এবং চন্দ্রের নিজস্ব আলো না থাকায় চন্দ্রসভায় রঙের বৈচিত্র্য বড় একটা দেখা যায় না।

প্রঃ 2. গর্ভস্থ স্ত্রী ভ্রূণকে নাকি পুরুষ ভ্রূণে পরিণত করা যায়? এও কি সম্ভব?

রুমা দত্ত ও ঝুমা দত্ত, ঠাকুরচক, বেলদা, মেদিনীপুর।

উঃ ব্যাপারটা আজকের বিজ্ঞানের অতীব জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ শাখা প্রজনন বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। উক্ত শাখাটির অভাবনীয়ভাবে উন্নতি হচ্ছে দিন দিন। এখনই উক্ত শাখার উল্লেখযোগ্য গবেষণাগুলিকে অবলম্বন করে গর্ভস্থ ভ্রূণের বংশগত রোগ বা কোন ত্রুটি নির্ণয় করা এবং তার প্রতিবিধান করা অনেকখানি সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে শিশুর সব রকমের ত্রুটি সংশোধন করতে পারবেন এবং শিশুকে মেধা ও দীর্ঘ পরমায়ু দান করবেন। কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানে রূপান্তরিতকরণ এর আসল উদ্দেশ্য নয়। তবে রূপান্তরও করা যেতে পারে।

ব্যাপারটা কিন্তু বেশ জটিল। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, মানুষের দেহকোষে থাকে 23 জোড়া ক্রোমোজোম। ওদের 22 জোড়া হচ্ছে অযৌন ক্রোমোজোম এবং মাত্র এক জোড়াই লিঙ্গ নির্ধারক বা যৌন ক্রোমোজোম। যে কোন সুস্থ স্ত্রীলোকের দেহকোষে যে যৌন ক্রোমোজোম জোড়াটি থাকে তাকে চিহ্নিত করা হয় x x (ডবল এক্স) দিয়ে এবং সুস্থ পুরুষের যৌন ক্রোমোজোম জোড়াটিকে xy দিয়ে।

মাতৃগর্ভে যে আদি কোষটি থেকে জীব তার যাত্রা শুরু করে সেই কোষটি প্রথম গঠিত হয় মাতার ডিম্বাণু থেকে পাওয়া 23টি এবং পিতার শুক্রাণু থেকে পাওয়া 23টি, মোট 46টি তথা 23 জোড়া ক্রোমোজোম দিয়ে। ঐ কোষের যৌন ক্রোমোজোম জোড়াটির ক্ষেত্রে যদি মাতার কাছ থেকে একটি x এবং পিতার কাছ থেকে একটি y পায় তা হলে সে হবে পুত্রসন্তান অপরদিক মাতার কাছ থেকে x এবং পিতারও কাছ থেকে x নিয়ে যৌন ক্রোমোজোম জোড়াটি গঠিত হয় তাহলে সে হবে কন্যা সন্তান।

এবার নিশ্চয়ই অনুমান করা যেতে পারে যে, আদি কোষটির যৌন ক্রোমোজোম জোড়াটি xx সনাক্ত করা যায় তাহলে একটি x-কে সরিয়ে নিয়ে একটি y যোগ করতে পারলে স্ত্রী ভ্রূণ পুরুষ ভ্রূণে পরিণত হতে পারবে। এটি টেস্ট টিউব বেবির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা সফলও হয়েছেন। x ও y-কে বাছাই করার পর মাতৃগর্ভে স্থাপন করেছেন এবং ইচ্ছানুযায়ী ফলও পেয়েছেন। তবে মাতৃগর্ভেএকটি পূর্ণ ভ্রূণের অসংখ্য কোষের যৌন ক্রোমোজোমগুলিকে পরিবর্তন করা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। হরমোন প্রয়োগের ফলেও অনেক সময় পরিবর্তন আনা যায় বলে জানা গেছে।

প্রঃ 3. চা খেলে কি কিছু উপকার হয়?

সঞ্জয় দাস, শিয়ালডাঙা, কুলটি।

উঃ সারাদিনে দু-এক কাপ চা-পানকে বিশেষজ্ঞরা শরীরের পক্ষে হিতকর বলেই উল্লেখ করে থাকেন। চায়ের উপক্ষারটি শরীরে রক্ত সঞ্চালনের সুবিধা করে দেয়। বিশেষ করে চাতে থাকে যৎসামান্য ফ্লোরাইড। ঐ ফ্লোরাইড অন্য কোন খাদ্য থেকে লাভ করা যায় না। অথচ আমাদের দাঁতকে ভাল রাখতে ফ্লোরাইড অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। উক্ত কারণে কোন কোন দেশ পানীয় জলের সঙ্গে ফ্লোরাইড মেশায় এবং কিছু কিছু টুথপেস্ট প্রস্তুত-কারক পেস্টের সঙ্গে ফ্লোরাইড মিশিয়ে থাকে। অথচ চিকিৎসকরা মনে করেন, উপরোক্ত দু উপায়ে প্রযুক্ত ফ্লোরাইড শরীর ভালভাবে গ্রহণ করতে পারে না। একমাত্র চা-পানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ফ্লোরাইড লাভ করা যায় বলে অনেকের বিশ্বাস। তবে অতিরিক্ত চা-পান বিধেয় নয়। দু-তিনবারের বেশি গ্রহণ করলে হিত অপেক্ষা অহিতই হয়ে থাকে। অপরদিকে চা যে পরিমাণ উপকারী, কফি সেই পরিমাণ অপকারী।

4. মহেশ, হুগলী থেকে লাইট ব্যানার্জী অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা রেখাগুলি কল্পনার মূলে যে কারণগুলি উল্লেখ করেছো তা ঠিকই হয়েছে।

প্রঃ 5. চৌম্বক ঝড় কি?

অনুপম মুখোপাধ্যায়, মণ্ডলগ্রাম, বর্ধমান।

উঃ সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় 6000° সে.।

কেন্দ্রের দিকে আরও বেশি প্রায় দু-কোটি ডিগ্রীর মত। উক্ত প্রচণ্ড তাপমাত্রায় সেখানকার গ্যাস কোন সময়ে স্থির থাকতে পারে না। লক্ষ লক্ষ মাইল উচ্চে লেলিহান অগ্নিশিখার উত্থান-পতনে সূর্যপৃষ্ঠে সব সময় বিক্ষুব্ধ। অর্থাৎ সব সময়ই চলছে আগুনের ঝড় ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণাবর্ত।

সূর্যপৃষ্ঠে আগুনের ঘূর্ণাবর্ত সব সময় চলতে থাকলেও সৌরকলঙ্কের উদ্ভব থেকে অনুমান করা হয়, প্রতি এগার বছর অন্তর প্রবল হয়ে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং পাঁচ বছর পরে অনেকখানি কমে আসে। অতঃপর পুনরায় সুরু করে বাড়তে। তখন ঘূর্ণাবর্তের ফলে সূর্যদেহে এমন সব গহ্বর সৃষ্টি হয় যে, অনায়াসে তার মধ্যে কয়েকটা পৃথিবীও তলিয়ে যেতে পারে।

সূর্যপৃষ্ঠের ঐ ঝড় ঝঞ্ঝা পৃথিবীকেও প্রভাবিত করে। বিক্ষুব্ধ সূর্যপৃষ্ঠ থেকে সব সময়ই ঝাঁকে ঝাঁকে তড়িতাহিত কণিকা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে। তাদের অধিকাংশকে আবার প্রতিহত করছে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র, কেবল অতি সামান্য মাত্র নেমে আসে ভূপৃষ্ঠে। সৌরকলঙ্ক বৃদ্ধি পাওয়ার সময় তড়িতাহিত কণিকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সেই সময় বেশি সংখ্যায় ওরা পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়। উক্ত অবস্থায় পৃথিবীপৃষ্ঠে একটা চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করে (কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোন ধাতব পরিবাহীর ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হতে থাকলে পরিবাহীর চারদিকে একটা চৌম্বকক্ষেত্র উৎপন্ন হয়)। এই অবস্থাকে বলা হয় চৌম্বক ঝটিকা এবং এই সময় পৃথিবীর বেতারবার্তা, টেলিফোন যোগাযোগ ইত্যাদির গোলমাল হয়ে পড়ে।

প্রঃ 6. ক্লোরোফিল থাকা সত্ত্বেও নটেশাক লাল কেন ?

তিমিরবরণ গলুই, দুর্গাপুর-9।

লাল শাকে কোন্ পদার্থের উপস্থিতির জন্য লাল দেখায় ? এর উপকারিতা কি ?

কাঞ্চন দাস, সুভাষ উদ্যান, পানিহাটি, 24-পরগনা।

উঃ লাল নটে শাক অথবা লাল ডাঁটাযুক্ত যে কোন শাক কিংবা হলদে অথবা লাল রঙের যে কোন ফল, মূল ইত্যাদিতে থাকে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ। ঐ রঞ্জক পদার্থটি ক্যারোটিন বা প্রোভিটামিন-এর লাল নটেশাক শুকনো লঙ্কা পাকা টমেটো ইত্যাদিতে থাকে ক্যারোটিনের অনুরূপ আর একটি রঞ্জক পদার্থ ক্রিপ্টোজেন্থিন। অবশ্য লাল শাক পাতায় ক্লোরোফিল নামক রঞ্জকটি যে একেবারে থাকে না এমন নয়।

ক্যারোটিন বা ক্রিপ্টোজেন্থিন নামক রঞ্জক পদার্থযুক্ত শাক বা ফল-মূল গ্রহণ করলে একটা সুবিধা পাওয়া যায়। যে কোন সুস্থ যকৃত অতি সহজে ঐ প্রোভিটামিন জাতীয় উপাদানের একটি বিশিষ্ট উৎসেচক বা এনজাইম ক্যারোটিন

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

ফেব্রুয়ারি সংখ্যার সিনিয়র ও জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

লীলা মজুমদারের

কল্প-বিজ্ঞানের গল্প

ফেব্রুয়ারি সংখ্যার সিনিয়র ও জুনিয়র ফটো ক্যুইজের উপহার

ধীরেন্দ্রলাল ধরের

দুরন্ত যাত্রী

গত এক বছরে প্রকাশিত সিনিয়র, জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট, ফটো ক্যুইজ ও আই কিউ টেস্টের সফল প্রতিযোগীদের এপ্রিল-মে '87 মাসে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট অর্পণ করা হবে।

— সম্পাদক

প্রতিযোগিতার কুপন

সিনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট, আই কিউ টেস্ট, এবং ফোটো ক্যুইজ-এর উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি..... .....

ঠিকানা ....

বয়স .... শ্রেণী ....

বিদ্যালয়ের নাম .....

আই কিউ টেস্ট / সিনিয়র / জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ফোটো ক্যুইজ-এর উত্তর পাঠালাম।

কিংবা ক্রিপ্টোজোস্থিনের সাহায্যে ভিটামিন এ-তে রূপান্তর ঘটায়।

ভিটামিন-এ শরীরের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। উক্ত উপাদানটি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বাড়ায় এবং দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখে। অভাবে অপুষ্টি, রাতকানা ইত্যাদি হয়ে থাকে। অথচ একে লাভ করা যায় দুধ, মাছ, ডিমের কুসুম, মাখন, মাংস, কমলালেবু প্রভৃতি দামী দামী খাদ্য থেকে। ঐ দামী খাদ্যগুলি সাধারণের পক্ষে গ্রহণ করা সব সময় সম্ভব হয় না। তাই অল্প দামের ঐ লাল শাক, রাঙালু, বীট, গাজর ইত্যাদিকে আমাদের খাদ্য তালিকাভুক্ত করা উচিত। মনে রাখতে হবে, প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ গ্রহণ আবার শরীরের পক্ষে খুবই খারাপ। হাড়, স্নায়ু, টিস্যুতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মাংস, মাছ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ভিটামিন-এ পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ না করে অপ্রত্যক্ষভবে কিছু কিছু লাল শাকসব্জী গ্রহণের সুবিধা যথেষ্ট।

প্রঃ 7. ভূ-ত্বকে এবং পাহাড়ের পাথরে ফাটল সৃষ্টি হয় কেন? সুপর্ণা গরাই, উক্তা, বর্ধমান।

উঃ পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত অস্থির অবস্থায় আছে তবু উপর থেকে প্রচণ্ড চাপ, ভয়ঙ্কর তাপমাত্রা, তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতি এবং মেরু অবলম্বনে পৃথিবীর আবর্তন সেই অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আর ঐ অস্থিরতার দরুন অভ্যন্তরে অনেক সময় শিলাচ্যুতি ঘটে। ফলে যে প্রচণ্ড ধাক্কার সৃষ্টি হয় তাতে ভূ-ত্বকটা যেখানে পুরু সেখানটা সামলে যায়। কিন্তু ভূ-ত্বকটা সব জায়গায় সমান পুরু নয় বলে কম পুরু অঞ্চলে কোথাও কোথাও ফাটলের সৃষ্টি হয়। বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভূমিকম্পের মাধ্যমে।

অপরদিকে ভূগর্ভস্থ তাপ ও পার্শ্বচাপে ভূ-ত্বক আলোড়িত হয়। তার ফলে শিলাস্তরে ভাঁজ পড়ে এবং সৃষ্টি হয় ভঙ্গিল পর্বতের। এশিয়ার হিমালয় পর্বতশ্রেণী ইওরোপের আল্পস, দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিজ পর্বতমালা ভঙ্গিল পর্বত ছাড়া অন্য কিছু নয়। এসব জায়গায় ভূত্বক বেশ কম পুরু, এদের বয়সও বেশী নয়, নিচের অংশ কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে পারেনি। তাই ভূ-ত্বকের আলোড়ন, শিলাচ্যুতি প্রভৃতির ফলে এদের গায়ে ফাটলের সৃষ্টি হয় বেশি। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল যেখানকার ভূত্বক বেশ পুরু এবং প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় এসে গেছে সেখানে ফাটল সৃষ্টি হতে পারে না।

সুধাংশু পাত্র

বাংলায় প্রকাশিত প্রথম ক্যুইজ বুকস সিরিজ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

শুধু প্রশ্নোত্তরের আসরে যাবার সাহসই আসবে না সেই সঙ্গে স্কুলের অনেক objective পরীক্ষার উত্তর দিতেও সুবিধা হবে। —*যুগান্তর*

সময় কাটানো ছাড়া অনুশীলন ও বুদ্ধিচর্চার প্রয়োজনে বইগুলি খুবই কাজের। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সব ক'টি বই সাহায্য করবে। —*দেশ*

Popularity of Quiz book to the belief that they groom students for Competitive Examinations
—*The Statesman*

আপনার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলার জন্যে এক্ষুণি এক সেট বই কিনে দিন

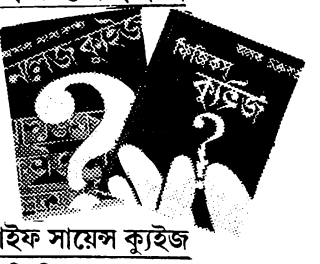

অমরনাথ রায় ॥ কেমিস্ট্রী ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ॥ নলেজ ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী ॥ ফিজিক্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ গণিত ক্যুইজ
তারকমোহন দাস ও সীমা সেন ॥ লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

প্রতিটি বই ১০ টাকা। দুটি বই একত্রে নিলে ভি পি চার্জ লাগবে না।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 6th Yr Vol – 10 · FEBRUARY 1987/Regd.No.WBEC/255

ক্লাস অ্যানুয়ালে বেশী নম্বরের জন্য

তারকমোহন দাস ও সীমা সেন	লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	সায়েন্স ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী	ফিজিক্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য	গণিত ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	নলেজ ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	কেমিস্ট্রী ক্যুইজ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড. কলি-৯ । প্রতিটি ১০ টাকা

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9 থেকে প্রকাশিত এবং 8A, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-6, নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-12। দাম ঃ 4·00 টাকা।